শেষের কবিতা

182 0 C 929.1

RARE BOOK

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4088
DATE 7/9/09
CALCUTTA

1638

15/14

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

শেষের কবিতা

প্রথম সংস্করণ (২১০০) ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল।

মূল্য—১॥০ ; বাঁধাই—২৲

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শেষের কবিতা

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিষ্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ ক'র্‌লে তখন তা'র শ্রী গেলো ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হ'লো বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা ক'রে অমিত এমন একটি বানান্ বানালে, যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তা'র উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেলো—অমিট্ রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টর। যে-পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেচেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিঁকে গেলো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এর কোঠায় পা দেবার পূর্ব্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেলো কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করেনি অথচ বিদ্যেতে ক'ম্‌তি আছে ব'লে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেননি তাঁর ইচ্ছে ছিলো, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্স-ফোর্ডের রং এমন পাকা ক'রে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্য-তায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেচে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্য-বাজারে যাদের নাম আছে তাদের ষ্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেম্‌নি, ঘাড়ে-গর্দ্দানে, সাম্‌নে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ছিলো নড়ব'ড়ে, বাংলাসাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাসে মরুভূমিতেই তা'র চলন।—সমালোচকদের কাছে সময় থাক্‌তে ব'লে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হ'লো মুখোস, ষ্টাইলটা হ'লো মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওম্‌রাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, ষ্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমী ষ্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েচেন,—বঙ্কিমী ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহন বাগানে", নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েচে মাটি ক'রে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যবসাদার নাচওয়ালীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখ্‌বার বেলায় বেনারসী ওড়নার ঘোম্‌টা চাই। কানাৎ হ'লো ফ্যাশানের, আর বেনারসী হ'লো ষ্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখ্‌বার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা স'র্‌তে ভরসা পায় না ব'লেই আমাদের দেশে ষ্টাইলের এতো অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্রচন্দ্রবরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশান-দুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুট্‌তো। শিবের ছিলো ষ্টাইল, এতো ওরিজিন্যাল-যে, মন্ত্রপড়া

যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বে-দস্তুর ব'লে জান্‌তো। অক্সফোর্ডের বি-এ মুখে এ-সব কথা শুন্‌তে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় ষ্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তা'রা "ন পুনরাবর্ত্তন্তে।"

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ সব কথা একেবারে সইতে পার্‌তো না—ব'ল্‌তো, "রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস্‌।" সে ছিলো ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম্‌-এ; তাকে প'ড়্‌তে হ'য়েচে বিস্তর, বুঝ্‌তে হ'য়েচে অল্প। সে-দিন সে আমাকে ব'ল্‌লে, "অমিত কেবলি ছোটো লেখককে বড়ো করে, বড়ো লেখককে খাটো কর্‌বার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তা'র সখ, তোমাকে সে ক'রেচে তা'র ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই-যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগেনি। দেখ্‌লুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খট্‌কা লাগে যখন দেখি, কতো কতো নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য ক'র্‌তে অমিতর বুক দমে না। তা'রা হ'লো, যাদের বলা যেতে পারে, বহুবাজারে চ'ল্‌তি লেখক, বড়ো বাজারের ছাপ-মারা; প্রশংসা কর্‌বার জন্যে যাদের লেখা প'ড়ে দেখ্‌বার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণ-গান ক'র্‌লেই পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা প'ড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে ক'র্‌তে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তা'রা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারী, বর্দ্ধমানের ওয়েটিং-রুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার ক'রেচে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেণের সেলুন কাম্‌রা।

অমিতর নেশাই হ'লো ষ্টাইলে। কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে,—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হ'লো একে-বারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকণ শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্ত্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া

চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চক্‌মকি-যে, ঠুন্ ক'রে একটু ঠুক্‌লেই স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এ-রকম ধুতি চ'ল্‌তি নয়। পাঞ্জাবী পরে, তা'র বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান-দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সাম্‌নের দিক্‌টা কনুই পর্য্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তা'রই বাঁ দিকে ঝুল্‌চে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তা'র মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কট্‌কি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুল্‌তে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসল-মানী লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। এ'কে ঠিক সাজ ব'ল্‌বো না, এ হ'চ্চে ওর এক-রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, যারা বোঝে তা'রা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে—ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্। নিজেকে

অপরূপ কর্‌বার সখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ কর্‌বার কৌতুক ওর অপর্য্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জ্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবী, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চ'লেচে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চ'লেচে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এদিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাক-নাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানী,—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, সাড়িটা গায়ে তির্য্যগ্‌ ভঙ্গীতে আঁট ক'রে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট্‌খুট্‌ ক'রে দ্রুত লয়ে চলে, উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপী রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর্‌ ফুর্‌ ক'রে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপরে ব'সে সেই

পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্দ্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জ্জন প্রকাশ ক'রে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তা'র দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে ক'রেই বাজিতে হারে, যে-রমণীর গলা বেস্থরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ্‌-রঙের কাপড় প'র্‌তে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলে, বিশেষ পক্ষ-পাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে-মানুষ অনেক দেবতার পূজারী, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো ব'লে স্তব করে, দেবতাদের বুঝ্‌তে বাকি থাকে না, অথচ খুসিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েচে, অমিত সোনার

রঙের দিগন্ত-রেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদেব সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এতো দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব ক'র্‌তে পারে,—নিকটে দাহ্যবস্তু থাক্‌লেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিক্‌নিকে গঙ্গার ধারে যখন ও-পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠ্‌লো ওর পাশে ছিলো লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে, "গঙ্গার ও-পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ-পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনো-দিনই আর হবে না।"

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্ত্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিলো,—কিন্তু সে জান্‌তো এ-কথাটায় যতোখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তা'র বেশি দাবি ক'র্‌তে গেলে বুদ্বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, "অমিট্, তুমি যা ব'ল্‌লে সেটা এতো বেশি সত্য-যে, না ব'ল্‌লেও

চ'ল্‌তো। এইমাত্র যে-ব্যাঙটা টপ্‌ ক'রে জলে লাফিয়ে প'ড়্‌লো এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনো-দিন ঘ'ট্‌বে না।"

অমিত হেসে উঠে ব'ল্‌লে, "তফাৎ আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাৎ। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিষ। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐক্যতানিক সৃষ্টি,—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাক্‌রা আছে সে যেমনি একটি নিখুঁৎ সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ ক'র্‌লে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হ'লো, তোমার ভাবনা রইলো না, অমিট্‌, বিশ্বকর্ম্মার স্যাক্‌রার বিল তোমাকে শুধ্‌তে হবে না।"

"কিন্তু, লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গল গ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তা'র কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে

মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্ত্তটিকে আমাদের সাম্‌নে এনে ধরে, চ'ম্‌কে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি ক'র্‌বো, তা'র পরে কী হবে ভেবে দেখো!"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না ক'রে ব'ল্‌লে, "তা'র পরে সোনার মুহূর্ত্তটি অন্যমনে খ'সে প'ড়্‌বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগ্‌লা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কতো মুহূর্ত্ত খ'সে প'ড়ে গেচে, ভুলে গেচো ব'লে তা'র হিসেব নেই।"

এই ব'লে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তা'র সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেলো।

অমিতর বোন সিসি লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে করো না কেন?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরী হ'চ্চে পাত্রী, তা'র নীচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক্ ক'র্‌লে, মেয়ে এতো আছে!"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে ক'র্‌তো সেই পুরাকালে,

লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তা'র পরিচয়।"

অমিত বলে, "আমি মনে-মনে যে-মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গর্-ঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্য্যন্ত এসে পৌছ'য় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্ব'লে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্য্যন্ত আসা ঘ'টেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইসারা ক'র্‌লেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তা'র কাল্‌চার নেই। কেন, ভাই, সে তো এম্-এতে বটানিতে ফার্ষ্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কাল্‌চার্।"

অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিছ্যে, আর ওর থেকে যে-আলো ঠিক্‌রে পড়ে তাকেই বলে কাল্‌চার্। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস্, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই না কি তা'র যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে ক'র্‌তে পাগল হ'য়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান ক'রে দেবো সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত ব'ল্‌লে, "পাগল না হ'লে বিমি বোস্‌কে বিয়ে ক'র্‌তে চাইবোই বা কেন? সে-সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়-স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েচে। তা'রা ঠিক ক'রেচে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উল্‌টো কথা ব'লে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধ'রে আন্‌বার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো ক'রে বেড়াচ্চে,—ফির্‌পোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্চে, যখন-তখন মোটরে চ'ড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌চে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিন্‌চে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্চে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আস্‌চে, আর ফিরিয়ে আন্‌চে না।

ওর বোনেরা ওর যে-অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হ'চ্চে ওর উল্‌টো কথা বলা। সজ্জন সভায় যা-কিছু সর্ব্বজনের অনুমোদিত ও তা'র বিপরীত কিছু-একটা ব'লে ব'স্‌বেই।

একদা কোনো এক জন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা ক'র্‌ছিলো, ও ব'লে উঠ্‌লো, "বিষ্ণু যখন সতীর মৃত-দেহ খণ্ড খণ্ড ক'র্‌লেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠ-স্থান তৈরি হ'য়ে গেলো। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যতো টুক্‌রো এরিষ্টক্রেসির পুজো ব'সিয়েচে,—ক্ষুদে ক্ষুদে এরিষ্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেলো, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের

কারো গাম্ভীর্য্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।"

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা ক'র্‌ছিলো পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্ ক'রে ব'ল্‌লে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য সুরু ক'র্‌বে। দুর্ব্বলের আধিপত্য অতি ভয়ঙ্কর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চ'টে উঠে ব'ল্‌লে, "মানে কী হ'লো ?"

অমিত ব'ল্‌লে, "যে-পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখীকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি সয়তানী তা'র জোগান দেয়।"

এক-দিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিলো আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হ'তে রাজি

হ'য়েছিলো ; গিয়েছিলো, মনে-মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিলো বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা-যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তা'র উদ্দেশ্য। দুই একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার ক'র্‌লে, প্রমাণটা এক-রকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে ব'ল্‌লে, "কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা ; পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্য্যন্ত। এ-কথা ব'ল্‌বো না-যে, পরবর্ত্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, ব'ল্‌বো অন্য কিছু চাই। ফজ্‌লি আম ফুরোলে ব'ল্‌বো না, 'আনো ফজলিতর আম !' ব'ল্‌বো, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ, ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হ'লো ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।*** রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই-যে, বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের নকল ক'রে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে-থেকে ফরাস পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির

হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই স'রে না পড়ে আমাদের কর্ত্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্ত্তী যিনি আস্‌বেন, তিনিও তাল ঠুকেই গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে আস্‌বেন-যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাক্‌বে মর্ত্ত্যে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'র্‌বে, তা'র পরে আস্‌বে তাকে বলি দেবার পুণ্য দিন,—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পূজোর প্রণালী এই রকমই। দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, চতুর্দ্দশপদী দেবতাদের পূজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিষটাকে একঘেয়ে ক'রে তোলার মতো অপবিত্র অধার্ম্মিকতা আর কিছু হ'তে পারে না।*** ভালো-লাগার এভোল্যুশন্ আছে। পাঁচ বছর পূর্ব্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে বেচারা জান্‌তে পারেনি-যে, সে ম'রে গেচে। একটু ঠেলা মার্‌লেই তা'র নিজের কাছে প্রমাণ হবে-যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তা'র অন্ত্যেষ্টি-সৎকার ক'র্‌তে বিলম্ব ক'রেছিলো, বোধ করি উপযুক্ত

উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মৎলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ ক'র্‌বো ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেচি।"

আমাদের মণিভূষণ চষমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন ক'র্‌লে, "সাহিত্য থেকে লয়াল্‌টি উঠিয়ে দিতে চান।"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেণ্টের দ্রুত নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই-যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরণে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌সো-করা। নতুন প্রেসিডেণ্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কানওয়ালা, গথিক গির্জ্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট্‌ বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।*** এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলা কলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে। যেমন ক'রে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো। মন

যদি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আপত্তি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ ক'র্‌তে আস্‌বে, তাই ক'র্‌তে গিয়েই তা'র হবে মরণ। তা'র পরে কিছু দিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠ্‌বে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে প'ড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বার ব্যবস্থা ক'র্‌বে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন, বায়রণের গলা জড়িয়ে ক'র্‌বো অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্স্‌কে ব'ল্‌বো, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েচি।*** মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের যতো মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলি গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্বুদ বানিয়ে চ'ল্‌তো তাহ'লে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পের'তো সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি ক'র্‌তো না। তাজ-মহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।

(এইখানে ব'লে রাখা দরকার, কথার তোড় সাম্‌লাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিলো, সে যা রিপোর্ট লিখেছিলো সেটা অমিতর

বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হ'য়ে উঠেছিলো। তারি থেকে যে-কটা টুক্‌রো উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌লুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েচি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্ত মুখে ব'লে উঠ্‌লো, "ভালো জিনিষ যতো বেশি হয় ততোই ভালো।"

অমিত ব'ল্‌লে,"ঠিক্ তা'র উল্টো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিষ অল্প হয় ব'লেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হ'য়ে যেতো মাঝারি।*** যে-সব কবি ষাট সত্তর পর্য্যন্ত বাঁচ্‌তে একটুও লজ্জা করে না, তা'রা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা ক'রে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারিদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগ্‌ড়ে যায়, পূর্ব্বের লেখা থেকে চুরি স্থুরু ক'রে হ'য়ে পড়ে পূর্ব্বের লেখার রিসীভর্স অফ্ ষ্টোল্‌ন্ প্রপার্টি। সে-স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্ত্তব্য হ'চ্চে, কিছুতেই এই সব অতি প্রবীণ কবিদের বাঁচ্‌তে না দেওয়া,—শারীরিক বাঁচার কথা ব'ল্‌চিনে,কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্ প্রবীণ অধ্যাপক,প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।"

সেদিনকার বক্তা ব'লে উঠ্‌লো, "জান্‌তে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট ক'র্‌তে চান? তা'র নাম করুন।"

অমিত ফস্‌ ক'রে ব'ল্‌লে, "নিবারণ চক্রবর্ত্তী।"

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠ্‌লো— "নিবারণ চক্রবর্ত্তী? সে লোকটা কে?"

"আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠ্‌বে।"

"ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।"

"তবে শুনুন।" ব'লে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিশে-বাঁধা খাতা বের ক'রে তা'র থেকে প'ড়ে গেলো :—

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

খোলো দ্বার,
বার্ত্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহা কালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তা'র দুরূহ উত্তর!

শুনিবে না!
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ!
ব্যর্থ ক্রোধ
হুঙ্কারিয়া পড়ে বুকে;
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট 'পরে,
আত্মঘাতী দম্ভ-ভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম্ম অঙ্গদ কুণ্ডল !
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টীকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিবো নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার !
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা' দিবার দাও অচিরাৎ !
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।
ভয়ে আর্ত্ত উঠিছে চীৎকারি'
দিগন্ত বিদারি',
"ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দ্দান্ত দুরন্ত ভিখারী,
তোর কণ্ঠধ্বনি,
ঘুরি' ঘুরি'
নিশীথ নিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।"

অস্ত্র আনো !
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো !
মৃত্যুরে মারুক্ মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি' যাবো দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
মুহূর্ত্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো !
হানো মোরে, হানো !
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্দ্ধস্বরে চাহিবো খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হ'য়ে যাবে খান্ খান্।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দুচোখ,
হেরিবে আলোক !

অগ্নি জ্বালো !
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক্ !
দূর করো শোক !
মোর অগ্নি-পরীক্ষায়
ধন্য হোক্ বিশ্বলোক অপূর্ব্ব দীক্ষায় !

আমার দুর্ব্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি',
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তি-লুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষা-জীর্ণ বুভুক্ষুরে !
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে

ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি' বজ্র-মুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি'
সঙ্গোপন বর্ষণ-সঞ্চয়
ছিন্ন করে মুক্ত করে সর্ব্বজগন্ময়॥

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ ক'রে গেলো। শাসিয়ে গেলো, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে মোটরে ক'রে অমিত যখন বাড়ি আস্‌ছিলো, সিসি তাকে ব'ল্‌লে, "একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্ত্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাক্‌তে গ'ড়ে তুলে পকেটে ক'রে নিয়ে এসেচো, কেবলমাত্র ভালো-মানুষদের বোকা বানাবার জন্যে!"

অমিত ব'ল্‌লে, "অনাগতকে যে-মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই।

নিবারণ চক্রবর্ত্তী আজ মর্ত্ত্যে এসে প'ড়্‌লো, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পার্‌বে না।"

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে-মনে খুব একটা গর্ব্ব বোধ করে। সে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকাল বেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যতো শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?"

অমিত ব'ল্‌লে, "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্ব্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ-কথাটাও আমার নোট বইয়ে লেখা আছে।"

"কিন্তু তোমার নিজের মত ব'লে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি ব'লে বসো।"

"আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তাহ'লে তা'র উপরে প্রত্যেক চল্‌তি মুহূর্ত্তের প্রতিবিম্ব প'ড়্‌তো না।"

সিসি ব'ল্‌লে, "অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।"

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেলো। তা'র কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে-দেবতা সর্ব্বদা শরসন্ধান ক'রে ফেরেন, তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল্ পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্ব্বতে যতো বিলাসী বস্‌তি আছে তা'র মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট প্র্যাক্‌টিসের জায়গা সব-চেয়ে সঙ্কীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ব'ল্‌লে, "যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছিনে।"

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস্ ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক্ প'রে বোন্‌রা গেলো চ'লে দার্জ্জিলিঙে। বিমি বোস্ আগেভাগেই সেখানে গিয়েচে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হ'লো তখন সে চারদিক চেয়ে আবিষ্কার ক'র্‌লে দার্জ্জিলিঙে জনতা আছে মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে ব'লে গিয়েছিলো, সে শিলঙে যাচ্চে নির্জ্জনতা ভোগের জন্যে—দু'দিন না যেতেই বুঝ্‌লে, জনতা না থাক্‌লে নির্জ্জনতার স্বাদ ম'রে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার সখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্‌ট্‌ না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাট্‌লো পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই প'ড়ে প'ড়ে। গল্পের বই ছুঁলো না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও প'ড়্‌তে লাগ্‌লো সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘ'ট্‌বে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য-জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না ; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধুয়ো নেই, তাল নেই, শম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিষ ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও-যে কেবলি

চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌চে, সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন সহরেও তেম্‌নি। কিন্তু সহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানা প্রকারে ক্ষয় ক'রে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হ'য়ে জ'মে জ'মে ওঠে। ঝর্‌না বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাব্‌চে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুসি, এমন সময় আষাঢ় এলো পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তা'র সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেলো, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েচে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কূলছাড়া ক'র্‌বে। স্থির ক'র্‌লে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুল্‌বে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে প'র্‌লো হাইলাণ্ডারী মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুক্‌তলাওয়ালা মজবুৎ চামড়ার জুতো, খাকি নর্ফোক কোর্ত্তা, হাঁটু পর্য্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস,

মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখ্‌তে হ'লো না,—মনে হ'তে পার্‌তো রাস্তা তদারক ক'র্‌তে বেরিয়েচে ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিলো গোটা পাঁচ সাত পাৎলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে-ঢাকা খদ্‌। এ-রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না ক'রে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লেচে। ঠিক সেই সময়টা ভাব্‌ছিলো, আধুনিককালে দূরবর্ত্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত—তা'র মধ্যে "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ" বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক ক'রে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূত-বর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে ক'রে যাত্রা ক'র্‌বে, হয়তো-বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে "দেহলীদত্তপুষ্পা।" যে-পথিকবধূকে এতোকাল ব'সিয়ে রেখেচে সেই অবন্তিকা হোক্‌ বা মালবিকাই হোক্‌, বা হিমালয়ের কোনো

দেবদারুবনচারিণীই হোক্ ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষ্যে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখ্‌লে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আস্‌চে। পাশ-কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক ক'ষ্‌তে ক'ষ্‌তে গিয়ে প'ড়্‌লো তা'র উপরে—পরস্পব আঘাত লাগ্‌লো, কিন্তু অপঘাত ঘ'ট্‌লো না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আট্‌কে থেমে গেলো।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তা'র পিছনে, তারি উপরে সে যেন ফুটে উঠ্‌লো একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হ'তে স্বতন্ত্র। মন্দার পর্ব্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে' ফুলে' কেঁপে উঠ্‌চে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখ্‌লে। ড্রয়িংরুমে এ-মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিতো না। পৃথিবীতে হয়তো দেখ্‌বার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখ্‌বার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের সাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে শাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকণ শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত ক'রে পিছু হটিয়ে চুল আঁট ক'রে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্য্যন্ত, দুহাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেচে, কট্‌কি-কাজ-করা রূপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তা'র সামনে চুপ ক'রে এসে দাঁড়ালো। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হ'লো, একটু কৌতুকও বোধ ক'র্‌লে। অমিত মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে, "অপরাধ ক'রেচি।"

মেয়েটি হেসে ব'ল্‌লে, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের সুরু আমার থেকেই।"

উৎস-জলের যে-উচ্ছলতা ফুলে' ওঠে, মেয়েটির

কণ্ঠস্বর তা'রি মতো নিটোল। অল্প বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিলো, এর গলার সুরে-যে-একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে তা'কে বর্ণনা করা যায় কী ক'রে। নোটবইখানা খুলে লিখ্‌লে, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হাল্‌কা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আস্‌চে,—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা ক'রে ব'ল্‌লে, "একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠ্‌তেই শোফার ব'লেছিলো এ রাস্তা হ'তে পারে না। তখন শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে ফের্‌বার উপায় ছিলো না। তাই উপরে চ'লেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হ'লো।"

অমিত ব'ল্‌লে, "উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে—একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারি কুকীর্ত্তি।"

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, "লোকসান বেশি হয়নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।"

অমিত ব'ল্‌লে, "আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি যেখানে অনুমতি ক'র্‌বেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।"

"দরকার আমারি, মাপ ক'র্‌লেন তা'র প্রমাণ।"

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইলো। অমিত ব'ল্‌লে, "আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই,—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম্ম নয়—এ-গাড়ি চালিয়ে পস্‌টারিটি পর্য্যন্ত পৌঁছ'বার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েচেন। অথচ এম্‌নি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন্‌-যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।"

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সঙ্কোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া একদমে গেলো ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জ্জন

পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর ক'র্‌লে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন ক'রে যা চোখে প'ড়্‌লো, প্রায় মাঝে মাঝে এ-যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তা'র গভীর ছাপ প'ড়ে গেলো, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না ব'লে মেয়েটি গাড়িতে উঠে ব'স্‌লো। তা'র নির্দ্দেশমতো গাড়ি পৌঁছ'লো যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে ব'ল্‌লে, "কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আস্‌বেন, আমাদের কর্ত্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো।"

অমিতর ইচ্ছে হ'লো বলে, "আমার সময়ের অভাব নেই, এখনি আস্‌তে পারি।" সঙ্কোচে ব'ল্‌তে পার্‌লে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখ্‌তে লাগ্‌লো ঃ—"পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামী ক'র্‌লে! দু-জনকে দু-জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান ক'রে দিলে। এস্‌ট্রনমার ভুল

ব'লেচে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে প'ড়েছিলো পৃথিবীর কক্ষপথে,—লাগ্‌লো তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চ'লেচে, এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা ব'ল্‌চে, আমাদের সুরু হ'লো যুগল-চলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথ্‌বো ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকীতে ভাগ্যের দ্বারে প'ড়ে থাকবার জো রইলো না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।"

বাইরে বৃষ্টি প'ড়্‌চে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি ক'র্‌তে ক'র্‌তে অমিত মনে-মনে ব'লে উঠ্‌লো, "কোথায় আছো নিবারণ চক্রবর্ত্তী! এইবার ভর করো আমার 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও!" বের'লো লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্ত্তী ব'লে গেলো :—

পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থী,
আমরা দুজন চ'ল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙীন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল,

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত ॥"

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুল-পুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাত-বেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যতো শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন গুচ্ছ ॥

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথ-পাশে পাখী পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তা'রে করি না খাঁচায়,

ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত॥

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পার্‌লে গল্পটার সাম্‌নে এগোবার বাধা হবে না।

পূর্ব্ব ভূমিকা

বাঙলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজ-বিদ্রোহের যে-ঝড় উঠেছিলো সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশঙ্কর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছ্লিয়ে স'রে এসেছিলো অনেক-খানি একালে। তিনি আগাম জ'ন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউবিলাসী পাখীর মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিলো।

এমন সকল পিতামহের নাতিরা যখন এই রকম তারিখের বিপর্য্যয় সংশোধন ক'র্তে চেষ্টা করে তখন তা'রা এক দৌড়ে পৌঁছ'য় পঞ্জিকার একেবারে উল্টো দিকের টার্মিনসে। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘ'ট্লো। জ্ঞানদা-

শঙ্করের নাতি বরদাশঙ্কর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ পিতামহের প্রায় আদিম পূর্ব্বপুরুষ হ'য়ে উঠ্‌লেন। মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা ব'লে ঠাণ্ডা ক'র্‌তে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া সুরু হ'লো; সহস্র দুর্গানাম লিখ্‌তে লিখ্‌তে দিনের পূর্ব্বাহ্ণ যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে-বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ ক'র্‌তে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিলো অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হ'লো, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফ্‌লেট্‌ ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ ক'র্‌তে কার্পণ্য ক'র্‌লেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্ম্মে জপে, তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র ক'রে বানালেন। অবশেষে গোদান স্বর্ণদান ভূমিদান কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক

কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপ্‌-কাট্‌লেট-খাওয়া, রামলোচন বাঁড়ুজ্জের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হ'য়েছিলো। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিলো না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন কি, তাঁদের কেউ-কেউ মাসিক-পত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেচেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার বিসর্গের ভুল চুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগ্‌লেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাস্‌পোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লো। চোখের উপরে তাঁর ঘোম্‌টা নাম্‌লো, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌তেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আস্‌তে হ'তো। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হ'তো বাজেয়াপ্ত,—প্রাক্‌বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্ত্তী রচনা ধরা প'ড়্‌লে চৌকাঠ পার হ'তে পেতো না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাঙলা অনুবাদ যোগমায়ার শেল্‌ফে অনেক-কাল থেকে অপেক্ষা ক'রে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষ্যে সেটা তিনি

আলোচনা ক'র্‌বেন এমন একটা আগ্রহ এ-বাড়ির কর্ত্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্য্যন্তই ছিলো। এই পৌরাণিক লোহার সিন্ধুকের মধ্যে নিজেকে সেফ্ ডিপজিটের মতো ভাঁজ ক'রে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিলো না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন। এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিলো। তিনি স্পষ্টই ব'ল্‌তেন, "মা, এ সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ়, তা'রা কেবল-যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে করো আমরা এ সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখোনি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উল্‌ট্‌পাল্‌ট্ ক'র্‌তে দুঃখ বোধ করি না—তা'র মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানিনে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজ্‌তে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুল্‌তে চাও না, তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা ক'রবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি

যা সত্য ব'লে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাবো।"

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রশ্ন ক'র্‌তেন-যে, বেদান্তরত্ন মশায় পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাক্‌তো না। বরদা-শঙ্কর তাঁর চারিদিকে ছোটো বড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন, তাদের প্রতি বেদান্তরত্ন মশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিলো; তিনি যোগমায়াকে ব'ল্‌তেন, "মা, সমস্ত সহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা ক'য়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্ম-ধিক্কার থেকে বাঁচিয়েচো।" এমনি ক'রে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিক্‌লি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেলো। জীবনটা আগা-গোড়াই হ'য়ে উঠ্‌লো আজকালকার খবরের কাগ্‌জি কিম্ভুত ভাষায় যাকে বলে "বাধ্যতামূলক।" স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশঙ্কর এবং মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন। শীতের সময় থাকেন ক'ল্‌-কাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে।

যতিশঙ্কর এখন প'ড়্‌চে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহুসন্ধানে তা'র শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েচেন। তা'রই সঙ্গে আজ সকালে আচম্‌কা অমিতর দেখা।

—————

৭

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমা কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন ক'রে মানুষ ক'রেচেন-যে, বহু পরীক্ষা পাশের ঘষাঘষিতেও তা'র বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারেনি। এমন কি, এখনো তা'র পাঠানুরাগ র'য়েচে প্রবল।

বাপের একমাত্র সখ ছিলো বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই সখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হ'য়েছিলো। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাস্‌তেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো জ্ঞানের চর্চ্চায় যার মনটা নিরেট হ'য়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠ্‌বার মতো সমস্ত ফাটল ম'রে যায়, সে-মানুষের পক্ষে বিয়ে কর্‌বার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস-যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামী-সেবা আবাদের যোগ্য যে-নরম জমিটুকু বাকি থাক্‌তে পার্‌তো সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেণ্ট ক'রে গাঁথা হ'য়েচে—খুব মজবুৎ

পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগ্‌লে দাগ পড়ে না। তিনি এতোদূর পর্য্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন-যে, লাবণ্যর নাইবা হ'লো বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হ'য়ে থাক্‌লো।

তাঁর আর একটি স্নেহের পাত্র ছিলো। তা'র নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এতো মনোযোগ আর কারো দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্য্যে তা'র চেহারাটি দেখ্‌বামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাৎ মুখচোরা, তা'র প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরীবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হ'য়ে চ'লেচে। ভবিষ্যতে শোভন-যে নাম ক'র্‌তে পার্‌বে, আর সেই খ্যাতি গ'ড়ে তোল্‌বার প্রধান কারিগরদের ফর্দ্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাক্‌বে এই গর্ব্ব অধ্যাপকের মনে ছিলো। শোভন আস্‌তো তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিলো তা'র অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখ্‌লে সে সঙ্কোচে নত

হ'য়ে যেতো। এই সঙ্কোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো ক'রে দেখ্‌তে লাবণ্যর বাধা ছিলো না। দ্বিধা ক'রে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননিগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হ'য়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেলো। নালিশ এই-যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেচেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের সখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপে পেন্সিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল ক'র্‌লে। ছবিটা আবিষ্কৃত হ'য়েচে শোভনলালের টিনের প্যাট্‌রার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননিগোপালের সন্দেহ ছিলো না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর-যে কতো বেশি, এবং আর কিছু দিন সবুর ক'রে থাক্‌লে সে দাম-যে কতো বেড়ে যাবে ননিগোপালের হিসাবী বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিলো। এমন মূল্যবান

জিনিষকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল কর্‌বার ফন্দি ক'র্‌চেন এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে? টাকা চুরি থেকে এর লেশমাত্র তফাৎ কোথায়?

এতোদিন লাবণ্য জান্‌তেই পারেনি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তা'র মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হ'য়েচে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফ্‌লেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জ্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে প'ড়েছিলো, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্‌ট্‌ বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেচে। গোলাপ-ফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিলো একটি বন্ধুর বাগানে, তা'র মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হ'লো। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট ক'রে, মুখ লাল ক'রে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেলো। দূর থেকে শোভনলাল তা'র আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেউ

জান্‌তো না। বি-এ পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিলো প্রথম স্থান, লাবণ্য পেয়েছিলো তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব দুঃখ দিয়েছিলো। তা'র দুটো কারণ ছিলো, এক হ'চ্চে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেক-দিন আঘাত ক'রেচে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হ'য়েছিলো বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা ক'রেছিলো খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেলো তখন এই স্পর্দ্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তা'র মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইলো-যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘ'ট্‌লো, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনো দিন অবনীশের কাছে এগোয়নি। কিছু দিন পর্য্যন্ত শোভনলালকে দেখ্‌লেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতো। এম্‌-এ পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেত্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। তবু হ'লো জিৎ। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হ'তো

তাহ'লে হয়তো সে খাতা ভ'রে কবিতা লিখ্‌তো—তা'র বদলে আপন পরীক্ষা পাশের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দিলে।

তা'রপরে এদের ছাত্র-দশা গেলো কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন-যে, জ্ঞানের চর্চ্চায় মনটা ঠাস বোঝাই থাক্‌লেও মনসিজ তা'র মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ,—সেই নিরতিশয় দুর্ব্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ ক'র্‌লে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ভেদ ক'রে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিলো না, একমাত্র বাধা লাবণ্যের প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধ্‌লো। পড়াশুনো ক'র্‌তে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তা'র চেয়ে জোর আছে এমন কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্‌ন্‌-রিভিয়ু থেকে তাঁর লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে,—অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সাম্‌নে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকেন, এক ভাঙা

বৌদ্ধস্তূপেরই মতো যার উপরে চেপে আছে বহুশত-বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তা'র দশা এইরকমই হ'য়ে থাকে। হাতী যখন চোরা-বালিতে পা দেয় তখন তা'র বাঁচ্‌বার উপায় কী?

এতোদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগ্‌লো। তাঁর মনে হ'লো, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখ্‌বার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তা'র মেয়ে ভালোবেসেচে, কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাস্‌তে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধ'র্‌লো, নিজের উপরে, ননিগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এলো। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় ক'রে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখ্‌বে ব'লে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনি তিনি তাকে বিশেষ আদর ক'রে চিঠি লিখ্‌লেন, ব'ল্‌লেন, "পূর্ব্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে ব'সেই তুমি কাজ ক'র্‌বে, কিছুমাত্র সঙ্কোচ ক'র্‌বে না।"

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে ধ'রে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যের সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ ক'রে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছো; যে-প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত, সে-সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি ক'র্‌তো তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা ক'র্‌তে পার্‌লে ও বেঁচে যেতো। ওর কতকগুলি নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জান্‌বার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো কথাই হ'লো না, গায়ে-প'ড়ে কিছু ব'ল্‌তে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তা'র খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওল্‌টাচ্চে, মাঝে মাঝে নোট্‌ নিচ্চে। তখন দুপুর বেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের

সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্ এক বাড়িতে যাচ্চেন তা'র নাম ক'র্লেন না,—ব'লে গেলেন, আজ আর চা খেতে আস্বেন না।

হঠাৎ একসময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেলো। শোভনলালের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্লো কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুক্লো। শোভন শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে কী ক'র্বে ভেবে পেলো না। লাবণ্য অগ্নিমূর্ত্তি ধ'রে ব'ল্লে, "আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?"

শোভনলাল চম্‌কে উঠ্লো, মুখে কোনো উত্তর এলো না।

"আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী ব'লেচেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সঙ্কোচ নেই?"

শোভনলাল চোখ নীচু ক'রে ব'ল্লে, "আমাকে মাপ ক'র্বেন, আমি এখনি যাচ্চি।"

এমন উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না-যে, লাবণ্যের পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ ক'রে এনেচেন। সে তা'র খাতা-পত্র সমস্ত সংগ্রহ ক'রে নিলে। হাত থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্চে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে

ঠেলা দিয়ে উঠ্‌তে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি থেকে সে চ'লে গেলো।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পার্‌তো, তাকে ভালোবাস্‌বার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফ'স্‌কে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উল্‌টো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান ক'র্‌বে ব'লেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিলো। শোভনলাল তেমন ক'রে ডাক দিলে না। তা'র পরে যা-কিছু হ'লো সবই গেলো তা'র বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার ক'র্‌লে। তা'র মনে হ'লো, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে ক'রেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেচেন, ওদের দু-জনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হ'লো সেই নিরপরাধের উপরে।

তা'র পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ ক'রে ক'রে অবনীশের বিবাহ ঘটালো। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্দ্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র

ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য ব'লে ব'স্‌লো, সে তা'র পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জ্জন ক'রে চালাবে। অবনীশ মর্ম্মাহত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "আমি তো বিয়ে ক'র্‌তে চাইনি, লাবণ্য, তুমিই তো জেদ ক'রে বিয়ে দিইয়েচো। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন ক'রে ত্যাগ ক'র্‌চো?"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যেই আমি এই সঙ্কল্প ক'রেচি। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। যে-পথে আমি যথার্থ সুখী হবো, সেই পথে তোমার আশীর্ব্বাদ চিরদিন রেখো।"

কাজ তা'র জুটে গেলো। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তা'র উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পার্‌তো, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়্‌বার অপমান স্বীকার ক'র্‌তে যতি কিছুতেই রাজি হ'লো না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চ'লে যাচ্ছিলো। উদ্বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিলো ইংরাজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে হালের বানার্ড শ'র আমল পর্য্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন্ ও গিল্‌বার্ট

মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা-যে একটু এলোমেলো ক'রে যেতো না তা ব'ল্‌তে পারিনে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে প'ড়্‌তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিলো না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে প'ড়্‌লো মোটর-গাড়িতে চ'ড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না ক'রে। হঠাৎ গ্রীস্‌-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হাল্‌কা হ'য়ে গেলো ;—আর-সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্ত্তমান ওকে নাড়া দিয়ে ব'ল্‌লে, "জাগো"। লাবণ্য এক মুহূর্ত্তে জেগে উঠে এতোদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখ্‌তে পেলে,— জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক্ বর্ত্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়্বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেলো। সে-ঘরে অমিত ব'স্‌লো যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারিদিকে চায়, সকল জিনিষ থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস ক'রে। শেল্‌ফে, পড়্বার টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখ্‌লে; সে-বইগুলো যেন বেঁচে উঠেচে। সব লাবণ্যের পড়া বই, তা'র আঙুলে পাতা-ওল্‌টানো, তা'র দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তা'র উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তা'র অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর প'ড়ে-থাকা বই। চম্‌কে উঠ্‌লো যখন টেবিলে দেখ্‌তে পেলে ইংরেজ কবি ডন্-এর কাব্য-সংগ্রহ। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাক্‌তে ডন্ এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিলো অমিতর প্রধান আলোচ্য,

এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক-জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ ক'র্‌লো।

এতোদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে গিয়েছিলো, যেন মাস্‌টারের হাতে ইস্কুলের প্রতিবছরে পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্‌স্‌ট্‌ বুক্‌। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিলো না আর বর্ত্তমান দিনটাকে পূরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিলো অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছ'লো একটা নতুন গ্রহে: এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতিমুহূর্ত্ত ব্যগ্র হ'য়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হ'য়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে-উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্ব্বাঙ্গ-প্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল-ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতোদিনের ধূলো-পড়া পর্দ্দা উঠে গেলো, সামান্য জিনিষের থেকে ফুটে উঠ্‌চে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ ক'র্‌লেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও

আজ অমিতকে বিস্ময় লাগ্‌লো। সে মনে-মনে ব'ল্‌লে, "আহা, এ তো আগমন নয়, এ-যে আবির্ভাব।"

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করেনি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েচে। গৌরবর্ণ মুখ টস্‌ টস্‌ ক'র্‌চে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন ক'রে সমস্ত দেহ সম্বৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্ম্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম ক'র্‌লে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা ব'য়ে গেলো।

প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া ব'ল্‌লেন, "তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্ব্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হ'তে ব'সেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েচেন। আমাকে ডাক্‌তেন বৌদিদি ব'লে।"

অমিত ব'ল্‌লে, "আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েচেন, আমি লোকসান ঘ'টিয়েচি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বৌদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "তোমার মা আছেন?"

অমিত ব'ল্‌লে, "ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিলো।"

"মাসির জন্যে খেদ কেন, বাবা?"

"ভেবে দেখুন না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাক্‌তো না; ব'ল্‌তেন এটা বাঁদরামি! গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে-মনে বলেন, ছেলেমানুষী।"

যোগমায়া হেসে ব'ল্‌লেন, "তাহ'লে না হয় গাড়িখানা মাসিরই হ'লো।"

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে ব'ল্‌লে, "এই জন্যেই তো পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মান্‌তে হয়। মায়ের কোলে জ'ন্মেচি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাঙাটাকে সৎকর্ম্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হ'লেন,—এর পিছনে কতো যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।"

যোগমায়া হেসে ব'ল্‌লেন, "কর্ম্মফল কার, বাবা? তোমার, না আমার, না যারা মোটর মেরামতের ব্যবসা করে তাদের?"

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে

অমিত ব'ল্‌লে, "শক্ত প্রশ্ন। কর্ম্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারি সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চ'লে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তা'র পরে?"

যোগমায়া লাবণ্যের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হ'তে না হ'তেই তিনি ঠিক ক'রে ব'সে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই ব'ল্‌লেন, "বাবা, তোমরা দুজনে ততোক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে আসি গে।"

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে স্নুরু ক'রে দিলে, "মাসিমা আমাদের আলাপ কর্‌বার আদেশ ক'রেচেন। আলাপের আদিতে হ'লো নাম। প্রথমেই সেটা পাকা ক'রে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার্ নেম্।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।"

"ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।"

"আপনি যে-কথাটা ব'ল্‌চেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of names প্রচার ক'রে আমি নামজাদা হবো স্থির ক'রেচি। তা'র গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।"

"আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্‌টার রয়।"

"একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক ক'র্‌তে গেলে মেপে দেখ্‌তে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছ'তে কতোক্ষণ লাগে।"

"দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।"

"বেগ দ্রুত ক'র্‌তে গেলে বস্তু কমাতে হবে অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "সহজ নয়, সময় লাগ্‌বে।"

"সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। এক-

ঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ ত্রিভুবনে নেই, ট্যাঁকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তা'র চাল। আইন্‌ষ্টাইনের এই মত।"

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌চে।"

"ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য্য ক'রে নেবো, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।"

"সময় আর নেই, কাজ আছে" ব'লেই লাবণ্য চ'লে গেলো।

অমিত তখনি স্নান ক'র্‌তে গেলো না। স্মিত হাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কী রকম একটি চেহারা ধ'রে উঠ্‌ছিলো, ব'সে ব'সে সেইটি ও মনে ক'র্‌তে লাগ্‌লো। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেচে, তাদের সৌন্দর্য্য পূর্ণিমা-রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তা'র সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে ক'রে গড়্‌বার সময় বিধাতা তা'র মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েচেন; তাকে দেখ্‌লেই বোঝা যায় তা'র মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মননের

শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এতো ক'রে আকর্ষণ ক'রেচে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য্য নেই, ও অনেক জেনেচে শিখেচে কিন্তু শান্তি পায়নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিলো যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনা-শক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

———

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিয়ে তা'র বেশিক্ষণ চলে না। সর্ব্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা পাহাড়পর্ব্বতের সঙ্গে হাসি-তামাসা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনো-রকম উল্টো ব্যবহার ক'র্‌তে গেলেই ঘা খেয়ে ম'র্‌তে হয়, তা'রাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তা'রা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তা'রা অরসিক, সেই জন্যে সহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হ'লো, শিলঙ পাহাড়টা চারদিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্চে। আজ সে উঠেচে সূর্য্য ওঠ্‌বার আগেই; এটা ওর স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখ্‌লে, দেবদারু-গাছের ঝালরগুলো কাঁপ্‌চে, আর তা'র পিছনে পাৎলা মেঘের উপর পাহাড়ের ও-পার থেকে সূর্য্য তা'র তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েচে—আগুনে-

জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠ্‌চে তা'র সম্বন্ধে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে প'ড়্‌লো। রাস্তা তখন নির্জ্জন। একটা শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন পাইন্ গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধ-ঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে ব'স্‌লো। সিগেরেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেলো ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বস্‌বার পূর্ব্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেই রকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্রদাগটাতে এসে পৌঁছোলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবী ক'র্‌বে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিলো সন্ধ্যে-বেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিলো বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ ক'রেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা প'ড়্‌লো-যে, তাতে ক'রেই এ-পক্ষের উৎসাহটাকে

কিছু যেন কুণ্ঠিত ক'র্‌লে। বোঝা শক্ত নয়-যে, তা'র কারণ দ্বি-বচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তা'র পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাক্‌বার উপলক্ষ্য ঘন ঘন ঘ'ট্‌তো। একটু বিশ্লেষণ ক'র্‌তেই বোঝা গেলো, সেগুলি অনিবার্য্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হ'লো, কর্ত্তা-মা এই দুটি আলোচনা-পরায়ণের যে-অনুরাগ লক্ষ্য ক'রেচেন, সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে-যে, মাসির বয়স হ'য়েচে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে ক'রেই আলোচনার উৎসাহ তা'র আরো প্রবল হ'লো। নির্দ্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর কর্‌বার অভিপ্রায়ে যতিশঙ্করের সঙ্গে আপোষে ব্যবস্থা ক'র্‌লে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য ক'র্‌বে। সুরু ক'র্‌লে সাহায্য,—এতো বাহুল্য-পরিমাণে-যে, প্রায়ই সকাল গড়াতো দুপুরে, সাহায্য গড়াতো বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্ত্তব্য হ'য়ে প'ড়্‌তো। এমনি ক'রে দেখা গেলো অবশ্যকর্ত্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশঙ্করের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিলো অসময়। ও ব'ল্‌তো, যে-জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তা'র ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সঙ্গত হয় না। এতোদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তা'র সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিল্‌পে গাড়ি ক'রে নিয়েছিলো। ও ব'ল্‌তো, এই চোরাই সময়টা অবৈধ ব'লেই ঘুমের পক্ষে সব-চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল-সকাল জাগ্‌বার একটা আগ্রহ তা'র অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে—তা'র পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হ'য়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েচে ; কিন্তু সময়-চুরির অপরাধ ধরা পড়্‌বার ভয়ে সেটা বারবার করা সম্ভব হ'তো না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখ্‌লে বেলা এখনো সাতটার এ-পারেই ! মনে হ'লো ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুন্‌লে টিক্‌টিক্ শব্দ।

এমন সময় চ'ম্‌কে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা

দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আস্‌চে লাবণ্য। সাদা সাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিন-কোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝ্‌তে বাকি নেই-যে, লাবণ্যর অর্দ্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হ'য়েচে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল ক'র্‌তে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্য্যন্ত লাবণ্য যেই গেচে, অমিত আর থাক্‌তে পার্‌লে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তা'র পাশে উপস্থিত।

ব'ল্‌লে, "জান্‌তেন এড়াতে পার্‌বেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চ'লে গেলে কতোটা অসুবিধা হয়?"

"কিসের অসুবিধা?"

অমিত ব'ল্‌লে, "যে-হতভাগা পিছনে প'ড়ে থাকে তা'র প্রাণটা উর্দ্ধস্বরে ডাক্‌তে চায়। কিন্তু ডাকি কী ব'লে? দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই-যে, নাম ধ'রে ডাক্‌লেই তাঁরা খুসি। দুর্গা দুর্গা ব'লে গর্জ্জন ক'র্‌তে থাক্‌লেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে-যে মুস্কিল।"

"না ডাক্‌লেই চুকে যায়।"

"বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন।

তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাক্‌তে চাই অথচ ডাক্‌তে পারিনে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।"

"কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যেস আছে।"

"মিস্ ডাট্? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিল্‌লো, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক কর্‌বার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি ক'র্‌লে, তারি মধ্যে র'য়ে গেলো স্বর্গমর্ত্তের ডাক-নাম। মনে হ'চ্চে না কি, একটা নাম ধ'রে ডাকা উপর থেকে নীচে আস্‌চে, নীচে থেকে উপরে উঠে চ'লেচে? মানুষের জীবনেও কি ঐ রকম নাম সৃষ্টি কর্‌বার সময় উপস্থিত হয় না? কল্পনা করুন না, যেন এখনি প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েচি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হ'লো, আকাশের ঐ রঙীন মেঘের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছোলো, সাম্‌নের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ-মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, মনে ভাব্‌তেও কি পারেন সেই ডাক্‌টা মিস্ ডাট্?"

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে ব'ল্‌লে, "নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।"

অমিত তা'র সঙ্গ নিয়ে ব'ল্‌লে, "চ'ল্‌তে শিখ্‌তেই মানুষের দেরি হয়, আমার হ'লো উল্‌টো, এতোদিন পরে এখানে এসে তবে ব'স্‌তে শিখেচি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অন্ধকার থাকৃতে কখন্ থেকে পথের ধারে ব'সে আছি। তাইতো ভোরের আলো দেখ্‌লুম।"

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখীটার নাম জানেন?"

অমিত ব'ল্‌লে, "জীবজগতে পাখী আছে সেটা এতোদিন সাধারণভাবেই জান্‌তুম, বিশেষভাবে জান্‌বার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য্য এই-যে স্পষ্ট জান্‌তে পেরেচি, পাখী আছে, এমন-কি, তা'রা গানও গায়।"

লাবণ্য হেসে উঠে ব'ল্‌লে, "আশ্চর্য্য!"

অমিত ব'ল্‌লে, "হাসচেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য্য রাখ্‌তে পারিনে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সর্ব্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে ম'র্‌তেও জানে না।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখীও যদি আপনার কথা শুন্‌তো, হেসে উঠ্‌তো।"

অমিত ব'ল্‌লে, "দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝ্‌তে পারে না ব'লেই হাসে, বুঝ্‌তে পার্‌লে চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌তো। আজ পাখীকে নতুন ক'রে জান্‌চি এ-কথায় লোকে হাস্‌চে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হ'চ্চে এই-যে, আজ সমস্তই নতুন ক'রে জান্‌চি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ!"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে?"

"এর জবাবে খুব একটা গম্ভীর কথাই ব'ল্‌তে হ'লো যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেচে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো,—ভোর-বেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিষ, নতুন ক'রে আবিষ্কার।"

কিছু না ব'লে লাবণ্য হাস্‌লে।

অমিত ব'ল্‌লে, "আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারা-ওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি।

বুঝেচি আপনি যে-কবির ভক্ত তা'র বই থেকে আমার মুখের এ-কথাটা আগেই প'ড়ে নিয়েচেন। দোহাই আপনার আমাকে দাগী চোর ঠাওরাবেন না,—এক এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শঙ্করাচার্য্য হ'য়ে ওঠে, ব'ল্‌তে থাকে আমিই লিখেচি, কি আর কেউ লিখেচে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন না, আজ সকালে ব'সে হঠাৎ খেয়াল গেলো আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি, যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখ্‌লুম, আর কোনো কবির লেখ্‌বার সাধ্যই ছিলো না।"

লাবণ্য থাক্‌তে পার্‌লে না, প্রশ্ন ক'র্‌লে, "বের ক'র্‌তে পেরেচেন ?"

"হাঁ, পেরেচি।"

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মান্‌লো না, জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্‌লে, "লাইনটা কী বলুন না।"

"For God's sake, hold your tongue
and let me love !"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠ্‌লো।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।"

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইসারায় জানিয়ে দিলে, "হুঁা।"

অমিত ব'ল্‌লে, "সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন্‌-এর বই আবিষ্কার ক'র্‌লুম, নইলে এ-লাইন আমার মাথায় আস্‌তো না।"

"আবিষ্কার ক'র্‌লেন ?"

"আবিষ্কার নয় তো কী ? বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বই-গুলিকে বহন করে, আপনার টেবিল দেখ্‌লুম, সে-যে বইগুলিতে বাসা দিয়েচে। সেদিন ডন্‌-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে পেয়েচি। মনে হ'লো, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড় ; বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালী বিদায়ের মতো। ডন্‌-এর কাব্যমহল নির্জ্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বস্‌বার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট ক'রে শুন্‌তে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্‌ !
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।"

লাবণ্য বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আপনি বাংলা কবিতা লেখেন না কি ?"

"ভয় হ'চ্চে আজ থেকে লিখ্‌তে সুরু ক'র্‌বো বা। নতুন অমিত রায় কী-যে কাণ্ড ক'রে ব'স্‌বে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো-বা সে এখনি লড়াই ক'র্‌তে বেরোবে ?"

"লড়াই ? কার সঙ্গে ?

"সেইটে ঠিক ক'র্‌তে পার্‌চিনে। কেবলি মনে হ'চ্চে খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এখ্‌খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তা'র পরে অনুতাপ ক'র্‌তে হয় র'য়ে ব'সে করা যাবে।"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।"

"সে-কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে ইংরেজ বাঁচিয়ে চ'ল্‌বো। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্ম্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চ'লেচে—তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে ব'ল্‌বো, যুদ্ধং দেহি! ঐ যে-লোক অজীর্ণ রোগ সার্‌বার জন্যে হাঁসপাতালে না গিয়ে এমন

পাহাড়ে আসে, ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হ'য়ে হাওয়া খেতে বেরোয়!"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "লোকটা তবু যদি অমান্য ক'রে চ'লে যায়।"

"তখন আমি পিছন থেকে দু'হাত আকাশে তুলে ব'ল্‌বো—এবারকার মতো ক্ষমা ক'র্‌লুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝ্‌তে পার্‌চেন, মন যখন খুব বড়ো হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব ক'রেছিলেন মনে ভয় হ'য়েছিলো, কিন্তু ক্ষমার কথা যে-রকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হ'লুম-যে, ভাবনা নেই।"

অমিত ব'ল্‌লে, "আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বেন?"

"কী, বলুন।"

"আজ ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।"

"আচ্ছা বেশ, তা'র পরে?"

"ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাৎলা-পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে যাচ্চে ঐখানে ব'স্‌বেন আসুন।"

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "কিন্তু সময়-যে অল্প।"

"জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্য দেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ মসক্‌ মাত্র জল, যাতে সেটা উছ্‌লে উছ্‌লে শুক্‌নো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্ক্‌চুয়াল হওয়া শোভা পায়; দেবতার হাতে সময় অসীম, তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য্য ওঠে ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্ক্‌চুয়াল হ'তে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিত-ব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'ভবে এসে ক'র্‌লে কী', তখন কোন্‌ লজ্জায় ব'ল্‌বো, 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তা'র দিকে চোখ তোল্‌বার সময় পাইনি।' তাইতো ব'ল্‌তে বাধ্য হ'লুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।"

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারো-যে আপত্তি থাক্‌তে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্ত্তা কয়। সেইজন্যে তা'র প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য ব'ল্‌লে, "চলুন।"

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেচে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্দ্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝর্‌নার ধারা একজায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার ক'রে তা'র উপর দিয়ে নিজের অধিকার-চিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেচে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে ব'স্‌লো। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হ'য়ে খানিকটা জল জ'মে আছে, যেন সবুজ পর্দ্দার ছায়ায় একটি পর্দ্দানসীন্ মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তা'র ভয়। এখানকার নির্জ্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগ্‌লো। সামান্য যা-তা একটা কিছু ব'লে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে ক'র্‌চে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আস্‌চে না,—স্বপ্নে যে-রকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝ্‌তে পার্‌লে, একটা-কিছু বলাই চাই। ব'ল্‌লে, "দেখুন আর্য্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু, আর একটা চ'ল্‌তি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিলো, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এই রকম জায়গার জন্যে। পাখীর গানের মতো, কবির কাব্যের মতো,—সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো

উচিত ছিলো, যেমন ক'রে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা! প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্‌টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি ক'র্‌তে হ'তো তা হ'লে কী হ'তো ভেবে দেখুন! সত্যি বলুন, লাবণ্য দেবী, এখনি আপনার সুর ক'রে কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছে ক'রচে না?"

লাবণ্য মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

অমিত ব'ল্‌লে, "চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তা'র হিসেব মিট্‌তে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই, অভদ্রও নেই। তাহ'লে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ কর্‌বার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চ'ল্‌চে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অতো সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।"

দিতে হ'লো অনুমতি, নইলে লজ্জা ক'র্‌তে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় ব'ল্‌লে, "রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।"

"হাঁ, লাগে।"

"আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ ক'র্বেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তা'র লেখা এতো ভালো-যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে ক'র্চি আমি তা'র থেকে আবৃত্তি করি।"

"আপনি এতো ভয় ক'র্চেন কেন?"

"এ-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে ক'র্লে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চ'ল্লে তাতে ক'রেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আরেকজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যতো রক্তপাত।"

"আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় ক'র্বেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করিনে।"

"এটা বেশ ব'লেচেন, তাহ'লে নির্ভয়ে সুরু করা যাক্।—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে,
যতোক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেখ্‌চেন? না-চেনার বন্ধন। সব-চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হ'য়েচি, চিনে-নিয়ে তবে খালাস পাবো, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি' শুধালেম, "কোথা সঙ্গোপনে
আছো আত্মবিস্মৃতির কোণে?"

নিজেকেই ভুলে-থাকার মতো কোনো এমন ঝাপ্‌সা কোণ আর নেই। সংসারে কতো-যে দেখবার ধন দেখা হ'লো না, তা'রা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই ব'লে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
ক'রে নেবো জয়

সংশয়-কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত ব'লে লবো টানি'
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে।

একেবারে না-ছোড়-বান্দা। কতো বড়ো জোর। দেখেচেন রচনার পৌরুষ!

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্ত্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না। সূর্য্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক্ নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।"—লাবণ্যর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ব'ল্‌লে,—

"হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি' দিক্,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি'
দিবো তাহে জীবন অঞ্জলি।"

আবৃত্তি শেষ হ'তে না হ'তেই অমিত লাবণ্যর হাতে চেপে ধ'র্‌লে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু ব'ল্‌লে না।

এর পরে কোনো কথা বল্‌বার কোনো দরকার হ'লো না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেলো।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে ব'ল্‌লে, "মাসিমা, ঘটকালি ক'র্‌তে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা ক'র্‌বেন না।"

"পছন্দ হ'লে তবে তো। আগে নাম-ধাম বিবরণটা বলো।"

অমিত ব'ল্‌লে, "নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।"

"তাহ'লে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ প'ড়্‌বে দেখ্‌চি।"

"অন্যায় কথা ব'ল্‌লেন। নাম যার বড়ো তা'র সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তা'র যতো সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।"

"আচ্ছা, নামটা না হয় খাটো হ'লো, রূপটা?"

"ব'ল্‌তে ইচ্ছে করিনে, পাছে অত্যুক্তি ক'রে বসি।"

"অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?"

"পাত্র বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিষ লক্ষ্য করা চাই,—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।"

"আচ্ছা নামরূপ থাক্‌, বাকিটা?"

"বাকি যেটা রইলো সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।"

"বুদ্ধি?"

"লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান ব'লে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।"

"বিদ্যে?"

"স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে-যে জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েচে মাত্র। তাঁর মতো সাহস ক'রে ব'ল্‌তে পারে না, পাছে লোকে ফস্‌ ক'রে বিশ্বাস ক'রে বসে।"

"পাত্রের যোগ্যতার ফর্দ্দটা তো দেখ্‌চি কিছু খাটো গোছের।"

"অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ ক'র্‌তে হবে ব'লেই

শিব নিজেকে ভিখারী কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।"

"তাহ'লে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।"

"জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাস্‌চেন কেন, মাসিমা? ভাব্‌চেন কথাটা ঠাট্টা!"

"সে-ভয় মনে আছে, বাবা, পাছে শেষ পর্য্যন্ত ঠাট্টাই হ'য়ে ওঠে।"

"এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।"

"বাবা, সংসারটাকে হেসে হাল্‌কা ক'রে রাখা কম ক্ষমতা নয়।"

"মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে-কথা বুঝেছিলেন।"

"আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হ'য়েচে?"

"কী রকম পরীক্ষা চান, বলুন।"

"একমাত্র পরীক্ষা হ'চ্চে, লাবণ্য-যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।"

"কথাটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করুন।"

"যে-রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেলো, তারো আসল মূল্য যে বোঝে সে-ই জান্‌বো জহুরী।"

"মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম ক'রে তু'ল্‌চেন। মনে হ'চ্চে যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েচেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা,—জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক, এক ভদ্র রমণীকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে ক্ষেপেচে। দোষেগুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুসি হ'য়ে তখনি ঢেঁকিতে আনন্দ-নাড়ু কুট্‌তে সুরু করেন।"

"ভয় নেই, বাবা, ঢেঁকিতে পা প'ড়েচে। ধ'রেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইচো। তা'র পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝ্‌বো লাবণ্যের মতো মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার তুমি যোগ্য।"

"আমি-যে এ-হেন আধুনিক আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন!"

"আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখ্‌লে?"

"দেখ্‌চি বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।"

"তা'র কারণ আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তা'রা ছিলো খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার মাসিমাদের খেলার সখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।"

"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে ক'রে এই তত্ত্ব প্রমাণ ক'র্‌বে ব'লেই অমিত রায় মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটর-গাড়িটা অচেতন পদার্থ হ'য়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে ব'স্‌বে কেন?"

"বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্ত্তায় লাগ্‌চে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হ'য়ে না দাঁড়ায়।"

"মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারি গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হাল্‌কা হ'য়ে ভেসে ওঠে, তাই ব'লে তা'র ওজন কমে না।"

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা ক'র্‌তে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। দেখা হ'লো যতিশঙ্করের সঙ্গে।

মনে প'ড়্‌লো আজ তাকে এণ্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিলো জীবের প্রতি দয়া ক'রেই আজ তা'র ছুটি নেওয়া আশু কর্ত্তব্য। সে ব'ল্‌লে, "অমিৎদা, কিছু যদি মনে না করো, আজ আমি ছুটি চাই, আপাব শিলঙে বেড়াতে যাবো।"

অমিত পুলকিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না, তা'রা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে ক'র্‌বো এমন অসম্ভব ভয় ক'র্‌চো কেন?"

"কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাবো—"

"ইস্কুল-মাস্‌টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিইনে। যে-ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হ'য়ে যায়।"

হঠাৎ যে-উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মেতে উঠ্‌লো তা'র মূল কারণটা অনুমান ক'রে যতির খুব মজা লাগ্‌লো। সে ব'ল্‌লে, "কয়দিন থেকে ছুটি-তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠ্‌চে।

সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চ'ল্‌লেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।"

"সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম ?"

ব'লেছিলে, "অকর্ত্তব্য বুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌-গুণ। তা'র ডাক প'ড়্‌লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না। ব'লেই বই বন্ধ ক'রে তখনি বাইরে দিলে ছুট্। বাইরে হয়তো একটা অকর্ত্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হ'য়েছিলো, লক্ষ্য ক'রিনি।"

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে-চাঞ্চল্য উঠেচে ওর নিজের মনেও তা'র আন্দোলনটা এসে লাগ্‌চে। ও লাবণ্যকে এতোদিন শিক্ষক জাতীয় ব'লেই ঠাউরেছিলো, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝ্‌তে পেরেচে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে ব'ল্‌লে, "কাজ উপস্থিত হ'লেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজার-দর বেশি, আকব্বরি মোহরের মতো,—কিন্তু ওর উল্‌টো পিঠে খোদাই থাকা উচিত অকাজ উপস্থিত হ'লেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।"

"তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যা'চ্চে।"

যতির পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে অমিত ব'ল্‌লে, "জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবন-পঞ্জিকায় একদিন যখন আস্‌বে দেবী-পূজায় বিলম্ব ক'রো না, ভাই, তা'র পরে বিজয়া দশমী আস্‌তে দেরি হয় না।"

যতি গেলো চ'লে, অকর্ত্তব্য-বুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় ক'রে অকাজ দেখা দেয় তারো দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেলো বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, একধারে সূর্য্যমুখীর ভিড়, আরেকধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালুঘাসের ক্ষেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস্‌ গাছ। তারি গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সাম্‌নে পা ছড়িয়ে ব'সে আছে লাবণ্য। ছাই-রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর প'ড়েচে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুক্‌রো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরে-ছিলো, তাও গেচে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়ালো, লাবণ্য মাথা তুলে তা'র মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলো, মৃদু হাসিতে মুখ গেলো ছেয়ে। অমিত সাম্‌না-

সাম্‌নি ব'সে ব'ল্‌লে, "সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েচি।"

লাবণ্য তা'র কোনো উত্তর না ক'রে অদূরে একটা নিস্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'র গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এলো। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টি-ভিখারীদলের একজন।

অমিত ব'ল্‌লে, "যদি আপত্তি না করো তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেবো।"

"তা দাও।"

"তোমাকে ডাক্‌বো বন্য ব'লে।"

"বন্য!"

"না, না, এ নামটাতে হয়তো-বা তোমার বদ্‌নাম হ'লো। এ-রকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাক্‌বো, বন্যা। কী বলো?"

"তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।"

"কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস ক'র্‌তে নেই। এ রইলো আমার মুখে আর তোমার কানে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আমারও ঐরকমের একটা বেসরকারী নাম চাই তো। ভাব্‌চি ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়? বন্যা হঠাৎ এলো তা'রই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।"

"নামটা সর্ব্বদা ডাক্‌বার পক্ষে ওজনে ভারি।"

"ঠিক ব'লেচো। কুলি ডাক্‌তে হবে ডাক্‌বার জন্যে। তুমিই তাহ'লে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারি সৃষ্টি।"

"আচ্ছা, আমিও দেবো তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে ব'ল্‌বো মিতা।"

"চমৎকার! পদাবলীতে ওরি একটি দোসর আছে, বঁধু। বন্যা, মনে ভাব্‌চি, ঐ নামে না হয় আমাকে সবার সাম্‌নেই ডাক্‌লে, তাতে দোষ কী?"

"ভয় হয় এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে শস্তা হ'য়ে যায়।"

"সে-কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা।"

"কী মিতা?"

"তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্‌ মিলটা লাগাবো জানো?—অনন্যা।"

"তাতে কী বোঝাবে?"

"বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।"

"সেটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়।"

"বলো কী, খুবই আশ্চর্য্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চম্‌কে ব'লে উঠি এ-মানুষটি একেবারে নিজের মতো। পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় ব'ল্‌বো—

"হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

"তুমি কবিতা লিখ্‌বে না কি?"

"নিশ্চয়ই লিখ্‌বো! কার সাধ্য রোধে তা'র গতি।"

"এমন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?"

"কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্য্যন্ত, ঘুম না হ'লে যেমন এ-পাশ ও-পাশ ক'র্‌তে হয়, তেমনি ক'রেই কেবলি অক্সফোর্ড বুক অফ্ ভর্সেস্-এর এ-পাত ও-পাত উল্‌টেচি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেক্‌তো। স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাচ্চি আমি লিখ্‌বো ব'লেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা ক'রে আছে।"

এই ব'লেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "হাত জোড়া প'ড়্‌লো, কলম ধ'র্‌বো কী দিয়ে! সব চেয়ে ভালো মিল হাতে-হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইচে কোনো কবিই এমন সহজ ক'রে কিছু লিখ্‌তে পার্‌লে না।"

"কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এতো ভয় করি, মিতা।"

"কিন্তু আমাব কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই ক'র্‌তে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে; তাতেই সীতাকে হারালেন! কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নি-পরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন, সে যাচাই ক'র্‌বে কী দিয়ে? তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্ম্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্ব'লেচে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার প'ড়ে নিচ্চি, কতো অল্পই টিঁক্‌লো! সব হু-হু শব্দে ছাই হ'য়ে যাচ্চে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে ব'ল্‌তে হ'লো, তোমরা অতো চেঁচিয়ে কথা ক'য়োনা, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake, hold your tongue
and let me love !"

অনেকক্ষণ ছু-জনে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তা'র পরে একসময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধ'রে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। ব'ল্‌লে, "ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীতে কতো অসংখ্য লোকই চাচ্চে, আর কতো অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখ্‌তে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপ্‌টস্‌ গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে প'ড়্‌তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র ক'ল্‌কাতার গোলদীঘি থেকে আরম্ভ ক'রে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্য্যন্ত চীৎকার শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এলো, সেই ছুর্দ্দান্ত বাজে খবরটা বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রধান খবর হ'য়ে উঠ্‌লো। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।"

"কোন্‌টা ভালো ?"

"ভালো এই-যে সংসারের আসল জিনিষগুলো

হাটেবাটেই চলাফেরা ক'রে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তা'র গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে।—আচ্ছা, বন্যা, আমি তো ব'কেই চ'লেচি, তুমি চুপ ক'রে ব'সে কী ভাব্‌চো বলো তো।"

লাবণ্য চোখ নীচু ক'রে ব'সে রইলো, জবাব ক'র্‌লে না।

অমিত ব'ল্‌লে, "তোমার এই চুপ ক'রে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত ক'রে দেওয়ার মতো।"

লাবণ্য চোখ নীচু ক'রেই ব'ল্‌লে, "তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়, মিতা।"

"ভয় কিসের?"

"তুমি আমার কাছে কী-যে চাও আর আমি তোমাকে কতোটুকুই বা দিতে পারি ভেবে পাইনে।"

"কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পারো এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।"

"তুমি যখন ব'ল্‌লে কর্ত্তা-মা সম্মতি দিয়েচেন আমার মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো। মনে হ'লো এইবার আমার ধরা পড়্‌বার দিন আস্‌চে।"

"ধরাই তো প'ড়্‌তে হবে।

"মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চ'ল্‌তে গিয়ে এক-দিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে প'ড়্‌বো, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাক্‌বে না। সে-দিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেবো না,—না, না, কিছু ব'লো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি ক'রে ব'ল্‌চি, আমাকে বিয়ে ক'র্‌তে চেয়ো না। বিয়ে ক'রে তখন গ্রন্থি খুল্‌তে গেলে তাতে আরো জট প'ড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েচি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চ'ল্‌বে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।"

"বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্য্যের মধ্যে, কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুল্‌চো?"

"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বল্‌বার জোর দিয়েচো। আজ তোমাকে যা ব'ল্‌চি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জানো। মান্‌তে চাও না, পাছে যে-রস এখন ভোগ ক'র্‌চো তাতে একটুও খট্‌কা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদ্‌বার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফেরো; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই

তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেচো। ব'ল্‌বো ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে-মনে জানো, যাকে তুমি সর্ব্বদাই বলো, ভাল্‌গার্‌। ওটা বড়ো রেস্‌পেক্টবল্‌; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া, সেই সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিষ যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্ম্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান্‌ দিয়ে বসে।"

"বন্যা, তুমি আশ্চর্য্য নরম সুরে আশ্চর্য্য কঠিন কথা ব'ল্‌তে পারো।"

"মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাক্‌তেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছো ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতোটুকু ভালো লাগে ততোটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না,—তাতেই আমি খুসি থাক্‌বো।"

"বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা ব'ল্‌তে দাও। কী আশ্চর্য্য ক'রেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা ক'রেচো। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'র্‌বো না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিষটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তা'র এক-রকম

শিক্‌লি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তা'র পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তা'র শিক্‌লি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তা'র আর-এক মূর্ত্তি।"

"আজ তুমি তা'র কোন্‌টা ?"

"যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিলো, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো, বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ ?"

লাবণ্য চুপ ক'রে রইলো।

অমিত ব'ল্‌লে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্ম্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হ'য়ে ওঠ্‌বার আগুন ওঠে জ্ব'লে! সেই আগুন জ্ব'লেচে, অমিত রায় বদ্‌লে গেলো। মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি

চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদ্‌লিয়ে দিয়েচো, বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা প'ড়্‌লো।"

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এলো। তবু এ কথা মনে না-ক'রে থাক্‌তে পার্‌লে না-যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হ'য়ে জ'মে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দু-জনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লে, "আচ্ছা, মিতা, তুমি কি মনে করো না, যে-দিন তাজমহল তৈরি শেষ হ'লো, সে-দিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে সাজাহান খুসি হ'য়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর কর্‌বার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিলো। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে

সাজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধ'রেচে।"

অমিত ব'ল্‌লে, "তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্চো। তুমি নিশ্চয়ই কবি।"

"আমি চাইনে কবি হ'তে।"

"কেন চাও না?"

"জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসব-সভা সাজাবার হুকুম পেয়েচে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।"

"বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার ক'র্‌চো? জানো না, তোমার কথা আমাকে কেমন ক'রে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী ক'রে জান্‌বে তুমি কী বলো, আর সে বলার কী অর্থ! আবার দেখ্‌চি নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে ডাক্‌তে হ'লো। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হ'য়ে গেচো! কিন্তু কী ক'র্‌বো বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হ'য়ে যায়নি,—ও প্রত্যেক বারেই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সে-দিন ওর খাতা ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে অল্পদিন আগেকার একটা

লেখা পাওয়া গেলো। ঝর্‌নার উপরে কবিতা,—কী ক'রে খবর পেয়েচে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝর্‌না আমি খুঁজে পেয়েচি। ও লিখ্‌চে ঃ—

ঝর্‌না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য্য তারা।

আমি নিজে যদি লিখ্‌তুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর ক'রে তোমার বর্ণনা ক'র্‌তে পার্‌তুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে-যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিচ্ছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখ্‌তে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হ'য়ে ব'সে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,

সে-ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি ;
দিয়ো তা'রে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী ॥

তুমি ঝর্না, জীবনস্রোতে তুমি-যে কেবল চ'ল্‌চো তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চলো তা'রাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরাণে আমার
মেতেচে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী,
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।”

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে ব'ল্‌লে, “যতোই আমার আলো থাক্‌ আর ধ্বনি থাক্‌, তোমার ছায়া

তবু ছায়াই, সে-ছায়াকে আমি ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বো না।"

অমিত ব'ল্‌লে, "কিন্তু একদিন হয়তো দেখ্‌বে আর কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ র'য়েচে।"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "কোথায়? নিবারণ চক্রবর্ত্তীর খাতায়?"

"আশ্চর্য্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে-ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন ক'রে সেটা বেরিয়ে আসে।"

"তা হ'লে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্ত্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাবো, আর কোথাও নয়।"

এমন সময় বাসা থেকে লোক এলো ডাক্‌তে,—খাবার তৈরি।

অমিত চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—যে, লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট ক'রে জান্‌তে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে-কথাটা ব'ল্‌লে, সেটার তো প্রতিবাদ ক'র্‌তে

পার্‌চিনে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ ক'র্‌তেই হয়, কেউ-বা করে জীবনে; কেউ-বা করে রচনায়,—জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তা'র থেকে স'র্‌তে স'র্‌তে, নদী যেমন কেবলি তীর থেকে স'র্‌তে স'র্‌তে চলে, তেম্‌নি। আমি কি কেবলি রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে স'রে স'রে যাবো? এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ? পুরুষ তা'র সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি ক'র্‌তে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তা'র সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা ক'র্‌তে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হ'লো? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত ক'র্‌বেই। যেখানে খুব ক'রে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাব্‌চি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে-পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি। এ কথাটা ভাব্‌তে অমিতকে পীড়া দিলো, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌লে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া ব'ল্‌লেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেচো?"

"ঠিক বুঝেচি, মা।"

"অমিত ভারি চঞ্চল, সে-কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এতো স্নেহ করি। দেখোনা, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন প'ড়ে প'ড়ে যায়।"

লাবণ্য একটু হেসে ব'ল্‌লে, "ওঁকে সবই যদি ধ'রে রাখ্‌তেই হ'তো, হাত থেকে সবই যদি খ'সে খ'সে না প'ড়্‌তো তাহ'লেই ওঁর ঘ'ট্‌তো বিপদ। ওঁর নিয়ম হ'চ্চে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা-যে আবার রাখ্‌তে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মিলে না।"

"সত্যি ক'রে বলি, বাছা, ওর ছেলেমানুষী আমার ভারি ভালো লাগে।"

"সেটা হ'লো মায়ের ধর্ম্ম। ছেলেমানুষীতে দায় যতো-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যতো-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন ব'ল্‌চো, দায় নিতে যে পারে না তা'র উপরে দায় চাপাতে?"

"দেখ্‌চো না, লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন, আজ-কাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেচে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বলো, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"তা বাসেন।"

"তবে আর ভাবনা কিসের?

"কর্ত্তা মা, ওঁর যেটা স্বভাব তা'র উপর আমি একটুও অত্যাচার ক'র্‌তে চাইনে।"

"আমি তো এই জানি, লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।"

"কর্ত্তা মা, সে-অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতোই প'ড়লেম ততোই এই কথাটা বার বার আমার মনে হ'য়েচে ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারেনি, নিজের

ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো ক'রে ব'দ্‌লিয়ে অন্যকে সৃষ্টি ক'র্‌বো।"

"তা, মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাত্‌তে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না ক'রে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ,—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বলো, তাই ঘটে।"

"সংসার পাত্‌বার জন্যেই যে-মানুষ তৈরি, তা'র কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তা'র গড়ন-পিটোন আপনিই ঘ'টুতে থাকে। কিন্তু যে-মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়্‌তে পারে না। যে-মেয়ে তা না বোঝে সে যতোই দাবি করে ততোই হয় বঞ্চিত, যে-পুরুষ তা না বোঝে সে যতোই টানা-হেঁচড়া করে ততোই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে, আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যে-রকম পায় সেই আর কি।"

"তুমি কী ক'র্‌তে চাও, লাবণ্য ?"

"বিয়ে ক'রে দুঃখ দিতে চাইনে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জানো, কর্ত্তা মা, খুঁৎখুঁতে মন যাদের, তা'রা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রী-পুরুষ-যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কার্‌বার ক'র্‌তে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখ্‌বার জো থাকে না।"

"লাবণ্য, তুমি নিজেকে জানো না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখ্‌তে পেয়েচেন ব'লে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ ক'রেচি অম্‌নি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা ক'য়ে উঠেচে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গ'ড়ে তুলেচেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা প'ড়্‌বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে ক'র্‌লে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

"তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পার্‌বে না?"

"স্বভাব যদি বদ্‌লায় তবে পার্‌বেন। কিন্তু বদ্‌লাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই না।"

"তুমি কী চাও?"

"যতোদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হ'য়েই থাক্‌বো। আর স্বপ্নই বা তাকে ব'ল্‌বো কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েচে। না হয় সে, গুটি থেকে বের হ'য়ে আসা দু-চার-দিনের একটা রঙীন প্রজাপতিই হ'লো, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে-যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্য্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলো, আর সূর্য্যাস্তের আলোতে ম'রেই গেলো তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই-যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হ'য়ে না যায়।"

"সে যেন বুঝ্‌লুম, তুমি অমিতর কাছে না-হয় ক্ষণকালের মায়ারূপেই থাক্‌বে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে ক'র্‌তে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?"

লাবণ্য চুপ ক'রে ব'সে রইলো, কোনো জবাব ক'র্‌লে না।

যোগমায়া ব'ল্‌লেন, "তুমি যখন তর্ক করো তখন বুঝ্‌তে পারি তুমি অনেক বই-পড়া মেয়ে, তোমার মতো ক'রে ভাব্‌তেও পারিনে, কথা কইতেও পারিনে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এতো শক্ত হ'তে পারিনে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেচি, মা। সে-দিন রাত তখন বারোটা হবে—দেখ্‌লুম তোমার ঘরে আলো জ্ব'ল্‌চে, ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর নুয়ে প'ড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদচো। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাব্‌লুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি, তা'র পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদ্‌বার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি ক'র্‌তে চাও না, ভালোবাস্‌তে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না ক'র্‌তে পার্‌লে তুমি বাঁচ্‌বে কী ক'রে? তাই তো বলি ওকে কাছে না পেলে তোমার চ'ল্‌বে না। বিয়ে ক'র্‌বো না ব'লে হঠাৎ পণ ক'রে ব'সো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপ্‌লে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।"

লাবণ্য কিছু ব'ল্‌লে না, নতমুখে কোলের উপর সাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। যোগমায়া ব'ল্‌লেন, "তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হ'য়েচে, অনেক প'ড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হ'য়ে গেচে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গ'ড়ে তুল্‌চো আমাদের সংসারটা তা'র উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিলো, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান্ দিতে চাও না। তা'রা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ ক'রে দেহটাকে যেন অগোচর ক'রে দিচ্চে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিলো—সমস্যা কিছু কম ছিলো না। আজ তোমরা এতোই বাড়িয়ে তুল্‌চো, কিছুই আর সহজ রাখ্‌লে না।"

লাবণ্য একটুখানি হাস্‌লে। এই সে-দিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিলো, তা'র থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেচে—এও তো সূক্ষ্ম; যোগমায়ার মা-ঠাক্‌রুণ এ-কথা এমন ক'রে বুঝ্‌তেন না। ব'ল্‌লে, "কর্ত্তা মা, কালের গতিকে মানুষের মন যতোই স্পষ্ট ক'রে সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে ততোই

শক্ত ক'রে তা'র ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেন না সেটা অস্পষ্ট।"

যোগমায়া ব'ল্লেন, "আজ আমার বোধ হ'চ্চে কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হ'লেই ভালো হ'তো।"

"না, না, তা ব'লো না। যা হ'য়েচে এ ছাড়া আর কিছু-যে হ'তে পার্‌তো এ আমি মনেও ক'র্‌তে পারিনে। এক সময়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো-যে, আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—কেবল বই প'ড়্‌বো আর পাস ক'র্‌বো এমনি ক'রেই আমার জীবন কাট্‌বে। আজ হঠাৎ দেখ্‌লুম আমিও ভালোবাস্‌তে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব-যে সম্ভব হ'লো এই আমার ঢের হ'য়েচে। মনে হয় এতোদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হ'য়েচি। এর চেয়ে আর কী চাই! আমাকে বিয়ে ক'র্‌তে ব'লো না, কর্ত্তা মা!"

ব'লে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

৯

বাসা বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক ক'রে রেখেছিলো অমিত দিন পনেরোর মধ্যে ক'ল্‌কাতায় ফির্‌বে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিলো-যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু-মাস যায়, ফের্‌বার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েচে,—রঙ্‌পুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল ক'রে ব'স্‌লো। অনেক খোঁজ ক'রে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেচে। এক সময়ে ছিলো গোয়ালার কি মালীর ঘর,—তা'র পরে একজন কেরাণীর হাতে প'ড়ে তাতে গরীবী ভদ্রতাব অল্প একটু আঁচ লেগেছিলো। সে কেরাণীও গেচে ম'রে, তারি বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সঙ্কীণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্‌ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্য্যের সঙ্গে, অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, "বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চ'লেচে ?"

অমিত উত্তর ক'র্‌লে, "উমার ছিলো নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্য্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হ'লো নিরাস্‌বাবের তপস্যা,—খাট পালঙ্‌ টেবিল কেদারা ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে প্রায় এসে ঠেকেচে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘ'টেছিলো হিমালয় পর্ব্বতে, এটা ঘ'টলো শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্চেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা,—এখন শেষ পর্য্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছোতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সার্‌তে হবে।"

অমিত হাস্‌তে হাস্‌তে কথাগুলো বলে কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় ব'ল্‌তে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো,—থেমে গেলেন। ভাব্‌লেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুল্‌চেন তা'র মধ্যে আমাদের হাত প'ড়্‌লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠ্‌তে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিষ-

পত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। লাবণ্যকে বারবার ব'ল্‌লেন, "মা, লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ ক'রো না।"

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখ্‌লেন, নড়ব'ড়ে একটা চার-পেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত এক্‌লা ব'সে একখানা ইংরেজি বই প'ড়্‌চে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসঙ্গত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তা'র নীচে অমিত পা ছড়িয়ে ব'সে গেলো। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তা'র পরে চ'ল্‌লো কাব্যা-লোচনা। মনটা ছুটেছিলো যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই ক'ল্‌কাতায় অমিত কিনেছিলো এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্ব্বদাই প্রয়োজন সেখানে আস্‌বার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয়নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিলো, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সঙ্কল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেচে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা

আছে প'ড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে ব'ল্লেন, "এ কী কাণ্ড অমিত?"

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে ব'ল্লে, "আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেচে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।"

"অসম্বদ্ধ প্রলাপ?"

"অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ ব'ল্লেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আল্‌গা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘ'ট্‌লেই চারিদিকে এলোমেলো অশ্রু-বর্ষণ হ'তে থাকে, আর বাইরের দিক্ থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ ক'রে উঠ্‌তে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রোটেসট্ স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া ক'রেচি,—ঘরের মিস্‌গভর্মেণ্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্‌সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।"

"মূলনীতিটা কী শুনি।"

"সেটা হ'চ্চে এই-যে, যে-ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যতোবড়ো ক্ষমতাশালীই হোক্ তা'র শাসনের চেয়ে যে-দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তা'র যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।"

আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হ'লো। অমিতকে তিনি যতোই গভীর ক'রে স্নেহ ক'র্‌চেন ততোই মনে-মনে তা'র মূর্ত্তিটা খুব উঁচু ক'রেই গ'ড়ে তুল্‌চেন। "এতো বিদ্যে, এতো বুদ্ধি, এতো পাস, অথচ এমন সাদা মন! গুছিয়ে কথা বল্‌বার কী অসামান্য শক্তি! আর যদি চেহারার কথা বলো আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেচে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এতো ক'রে দুঃখ দিচ্চে। খামকা ব'লে ব'স্‌লেন কিনা, বিয়ে ক'র্‌বেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী! ধনুক-ভাঙা পণ! এতো অহঙ্কার সইবে কেন? পোড়ামুখীকে-যে কেঁদে কেঁদে ম'র্‌তে হবে।"

একবার যোগমায়া ভাব্‌লেন অমিতকে গাড়িতে ক'রে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তা'র পরে কী ভেবে ব'ল্‌লেন, "একটু ব'সো, বাবা, আমি এখনি আস্‌চি।"

বাড়ি গিয়েই চোখে প'ড়্‌লো, লাবণ্য তা'র ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির

"মা" ব'লে গল্পের বই প'ড়্চে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে-মনে রাগ আরো বেড়ে উঠ্লো।

ব'ল্লেন, "চলো, একটু বেড়িয়ে আস্বে।"

সে ব'ল্লে, "কর্ত্তা মা, আজ বেরোতে ইচ্ছে ক'র্চে না।"

যোগমায়া ঠিক বুঝ্লেন না-যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েচে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, তা'র মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিলো কখন আস্বে অমিত। কেবলি মন ব'লেচে এলো বুঝি। বাইরে দম্কা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন্ গাছগুলো থেকে থেকে ছট্ফট্ করে, আর দুর্দ্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝর্না গুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাদের পাল্লা চ'লেচে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হ'য়ে উঠ্লো, —যাক্ সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধ'রে ব'লে উঠি—জন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ-যে মরীয়া হ'য়ে উঠ্লো, হূহূ ক'রে কী-যে হেঁকে উঠ্চে তা'র ঠিক নেই, তারি ভাষায় আজ বন-বনান্তর

ভাষা পেয়েচে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো। অমনি ক'রেই কেউ শুন্‌তে আসুক লাবণ্যের কথা, অম্‌নি মস্ত ক'রে, স্তব্ধ হ'য়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন-যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলো। এর পরে যখন কেউ আস্‌বে তখন কথা জুট্‌বে না, তখন সংশয় আস্‌বে মনে, তখন তাণ্ডব-নৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চ'লে যায়, তা'র মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোল্‌বার চাবিটি যদি না পাওয়া গেলো, তবে কোনো দিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বল্‌বার দৈব-শক্তি আর জোটে না। যে-দিন সেই বাণী আসে সে-দিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখীর মতো। কতো-দিন থেকে, কতো দূর থেকে আস্‌চে, সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতোদিন অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন। স্পর্শ ক'র্‌লো আজ সেই

কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হ'য়ে উঠ্‌লো। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, সত্য, সত্য, এতো সত্য আর কিছু নেই।

সময় চ'লে গেলো, অতিথি এলো না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন্‌ টন্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এলো জলের ঝাপ্‌টা লাগিয়ে। তা'র পরে একটা গভীর অবসাদে তা'র মনটাকে ঢেকে ফেল্‌লে, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হ'লো ওর জীবনে যা জ্বল্‌বার তা একবার মাত্র দপ ক'রে জ্ব'লে তা'র পরে গেলো নিবে, সাম্‌নে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে স্বীকার ক'রে নিতে ওর সাহস চ'লে গেলো। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে-একটা ভরসা জেগেছিলো সেটা ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেলো মন দিতে, তা'র পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ ক'রে কখন্‌ নিজেকে ভুলে গেলো তা জান্‌তে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাক্‌লেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হ'লো না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সাম্‌নে ব'স্‌লেন, দীপ্ত চোখ তা'র মুখে রেখে ব'ল্‌লেন, "সত্যি ক'রে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাসো ?"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে ব'ল্‌লে, "এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌চো, কর্ত্তা মা ?"

"যদি না ভালোবাসো ওকে স্পষ্ট ক'রেই বলো না কেন ? নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধ'রে রেখোনা।"

লাবণ্যের বুকের ভিতরটা ফুলে' ফুলে' উঠ্‌লো, মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না।

"এই মাত্র যে-দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও প'ড়ে আছে ? ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে-যে কতো বড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝ্‌তে পারো না ?"

চেষ্টা ক'রে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য ব'লে উঠ্‌লো—"আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চো,

কর্ত্তা মা? আমি তো ভেবে পাইনে আমার চেয়ে ভালোবাস্‌তে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি-যে ম'র্‌তে পারি। এতোদিন যা ছিলুম সব-যে আমার লুপ্ত হ'য়ে গেচে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ-যে কতো আশ্চর্য্য সে আমি কাউকে কেমন ক'রে জানাবো? আর কেউ কি এমন ক'রে জেনেচে?"

যোগমায়া অবাক হ'য়ে গেলেন: চিরদিন দেখে এসেচেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতো বড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতোদিন লুকিয়ে ছিলো? তাকে আস্তে আস্তে ব'ল্‌লেন, "মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে,—সম্পূর্ণ ক'রে তা'র কাছে তুমি আপনাকে জানাও,—একটুও ভয় ক'রো না। যে-আলো তোমার মধ্যে জ্ব'লেচে সে-আলো যদি তা'র কাছেও প্রকাশ পেতো তাহ'লে তা'র কোনো অভাব থাক্‌তো না। চলো, মা, এখনি চলো আমার সঙ্গে।"

দু-জনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তা'র উপর ব'সেচে। টেবিলে এক দিস্তে ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তা'র চ'ল্‌চে লেখা। সেই সময়েই সে তা'র বিখ্যাত আত্মজীবনী সুরু ক'রেছিলো। কারণ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, সেই সময়েই তা'র জীবনটা অকস্মাৎ তা'র নিজের কাছে দেখা দিয়েছিলো নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকাল বেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো—সে-দিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিলো, সে কথাটা প্রকাশ না ক'রে সে থাক্‌বে কী ক'রে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তা'র জীবনী লেখা হয়, তা'র কারণ, একদিকে সংসারে সে মরে, আর একদিকে মানুষের মনে সে নিবিড় ক'রে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই-যে, শিলঙে সে যখন ছিলো তখন একদিকে সে ম'রেছিলো, তা'র অতীতটা গিয়েছিলো মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর একদিকে সে

উঠেছিলো তীব্র ক'রে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েচে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘ'ট্‌তে পারে, তা'রা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে-বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা ক'রেচে তা'রই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি প'ড়্‌চে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেচে থেমে, মেঘ এসেচে পাৎলা হ'য়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "এ কী অন্যায় মাসিমা!"

"কেন, বাবা, কী ক'রেচি?"

"আমি-যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন?"

"শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাব্‌তে দেওয়াই তো দরকার। যা জান্‌বার সবটাই-যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এতো আশঙ্কা কেন?"

"শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছো তুমি, আমার মাসিমা।"

"এমন ভেদবুদ্ধি কেন, বাছা ?"

"নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য্য দিয়েই ঐশ্বর্য্য দাবী ক'র্‌তে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্ব্বাদ। মানব-সভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগিয়েচেন ঐশ্বর্য্য, আর মাসিমারা এনেচেন আশীর্ব্বাদ।"

"দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে, অমিত ; অভাব ঢাক্‌বার দরকার হয় না।"

"এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হ'য়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড্‌ কাব্যকে ব'লেচেন ক্রিটিসিজম্‌ অফ্‌ লাইফ্‌, আমি কথাটাকে সংশোধন ক'রে ব'ল্‌তে চাই লাইফ্‌স্‌ কমেণ্টারি ইন্‌ ভার্স্‌। অতিথিবিশেষকে আগে থাক্‌তে জানিয়ে রাখি যেটা প'ড়্‌তে যাচ্ছি সে-লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয় :—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস্‌নে তা'রে,
সিক্ত চোখে যাস্‌নে দ্বারে।

ভেবে দেখ্‌বেন, ভালোবাসাই হ'চ্চে পূর্ণতা, তা'র যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা

যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনি আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আন্‌বি যবে
মাল্য-বদল তখন হবে,
পাত্‌বি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধূলায় পথের ধারে?

সেই জন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে ব'লেছিলুম। পাত্‌বার কিছুই নেই তো পাত্‌বো কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকী কালীর দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি ব'ল্‌চেন, ডাক্‌বার মানুষকে ডাকি, যখন জীবনের পেয়ালা উছ্‌লে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার সরিক হ'তে ডাকিনে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস্ নিত্য-ধনে,
লক্ষ শিখায় জ্ব'ল্‌বে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই

কুটীরে তা'রই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক ক'রে রেখেচি এই কুটীরের নাম দেবো মাস্‌তুতো বাঙ্‌লো।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্য্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটীরেও তোমার সে-সাধনা ভিজে কাগজে চাপা প'ড়্‌বে না। বর পাইনি ব'লে নিজেকে ভোলাচ্চো? মনে-মনে নিশ্চয় জানো পেয়েচো!"

এই ব'লে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তা'র ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখ্‌লেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দু-জনের হাত বেঁধে ব'ল্‌লেন, "তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক্‌।"

অমিত লাবণ্য দু-জনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'র্‌লে। তিনি ব'ল্‌লেন, "তোমরা একটু ব'সো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।"

ব'লে গাড়ি ক'রে ফুল আন্‌তে গেলেন। অনেক-ক্ষণ দুইজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ ক'রে ব'সে রইলো। এক-সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ

তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে, "আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন ?"

অমিত উত্তর দিলে, "কারণটা এতো বেশি তুচ্ছ-যে আজকের দিনে সে-কথাটা মুখে আন্‌তে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না-যে হাতের কাছে বর্ষাতি ছিলো না ব'লে বাদ্‌লার দিনে প্রেমিক তা'র প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেচে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ-জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাট্‌চি নে ভাব্‌চো ? সে-অকূল কোনোকালে কি পার হবো ?

For we are bound where mariner has not
yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves
and all.

আমরা যাবো যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি',
ডুবি যদি তো ডুবি না কেন,
ডুবুক্‌ সবি, ডুবুক্‌ তরী ॥

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা ক'রে ছিলে ?"

"হাঁ, মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেচি। মনে হ'য়েচে কতো অসম্ভব দূর থেকে-যে আস্‌চো তা'র ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছোলে আমার জীবনে।"

"বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিলো এতোকাল তোমাকে না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত্ত। ঐখানটা ছিলো সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভ'রে উঠ্‌লো—তা'রই উপরে আলো ঝল্‌মল্‌ করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হ'য়েচে সব চেয়ে সুন্দর। এই-যে আমি ক্রমাগতই কথা ক'য়ে যাচ্চি এ হ'চ্চে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণ-সরোবরের তরঙ্গধ্বনি, এ'কে থামায় কে!"

"মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী ক'র্‌ছিলে?"

"মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে চাচ্ছিলুম,—কোথায় সেই কথা! আকাশ থেকে বৃষ্টি প'ড়্‌চে আর আমি কেবলি ব'লেচি, কথা দাও, কথা দাও।

O what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be

Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.
এ কী রহস্য, এ কী আনন্দরাশি !
জেনেছি তাহারে, পাইনি তবুও পেয়ে !
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিঃশ্বাসি',
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

ব'সে ব'সে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা ক'রে তুলি। সুর দিতে পার্‌তুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'র্‌তুম,—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া !

যাকে না হ'লে চলে না, তাকে না পেয়ে কী ক'রে দিনের পর দিন কাট্‌বে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়! উপরে চেয়ে কখনো বলি, কথা দাও, কখনো বলি, সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর কাউকে দিয়ে বসেন,—হয়তো বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তা'রাও তোমার মতো এতো বার বার ক'রে তাঁকে স্মরণ করে না।"

"বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি ব'ক্‌চি, না? আমার মধ্যে বকুনির মন্‌সুন্‌ নেমেচে। ওয়েদার রিপোর্ট যদি রাখো তো দেখ্‌বে এক একদিনে কতো ইঞ্চি পাগলামি তা'র ঠিকানা নেই। ক'ল্‌কাতায় যদি থাক্‌তুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে ক'রে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে মোরাদাবাদে কেন, তা'র কোনোই কারণ দেখাতে পার্‌তুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাস্‌তে হাস্‌তে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এমন সময় ডালিতে ভ'রে যোগমায়া সূর্য্যমুখী ফুল আন্‌লেন। ব'ল্‌লেন, "মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।"

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিষকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোল্‌বার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে ব'ল্‌লে, "বন্যা একটি আঙটি তোমাকে পরাতে চাই।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "কী দরকার, মিতা !"

"তুমি-যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েচো সে কতোখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ ক'র্‌তে পারিনে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যতো কথা ক'য়েচে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কতো ইসারা ; ভালোবাসার যতো-কিছু আদর, যতো-কিছু সেবা হৃদয়ের যতো দরদ যতো অনির্ব্বচনীয় ভাষা, সব-যে ঐ হাতে। আঙটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাক্‌বে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো ; সে-কথাটি শুধু এই, 'পেয়েচি।' আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মাণিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক্ না।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, তাই থাক্।"

"ক'ল্‌কাতা থেকে আন্‌তে দেবো, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাসো।"

"আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাক্‌লেই হবে।"

"আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।"

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হ'য়ে গেলো আগামী অঘ্রাণ মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া ক'ল্‌কাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন ক'র্‌বেন।

লাবণ্য অমিতকে ব'ল্‌লে, "তোমার ক'ল্‌কাতায় ফের্‌বার দিন অনেককাল হ'লো পেরিয়ে গেচে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিলো। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চ'লে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"এমন কড়া শাসন কেন ?"

"সে-দিন যে সহজ আনন্দের কথা ব'লেছিলে তাকে সহজ রাখ্‌বার জন্যে।"

"এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সে-দিন তোমাকে কবি ব'লে সন্দেহ ক'রেছিলুম, আজ সন্দেহ ক'র্‌চি ফিলজফার ব'লে। চমৎকার ব'লেচো। সহজকে সহজ রাখ্‌তে হ'লে শক্ত হ'তে হয়। ছন্দকে

সহজ ক'র্‌তে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় ক'সে আঁট্‌তে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা কালই চ'লে যাবো, একেবারে হঠাৎ এই ভরা-দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চ'ম্‌কে থেমে-যাওয়া লাইনটা—

—চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।

শিলঙ থেকে আমি না হয় চল্লুম কিন্তু পাঁজি থেকে অগ্রাণ মাস তো ফস্‌ ক'রে পালাবে না। ক'ল্‌কাতায় গিয়ে কী ক'র্‌বো জানো?"

"কী ক'র্‌বে?"

"মাসিমা যতোক্ষণ ক'র্‌বেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা, ততোক্ষণ আমাকে ক'র্‌তে হবে তা'র পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে, বন্যা, রঘুবংশে অজ মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা ক'রেছিলেন?"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অমিত ব'ল্‌লে, "সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্ব্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তা'র পর থেকে মিলনটাকে এতো অবহেলা।"

"মিলনের আর্ট তোমার মনে কী-রকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা ক'র্‌তে চাও আজই তা'র প্রথম পাঠ সুরু হোক্।"

"আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর ক'র্‌তে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামী জিনিষকে এতো সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা শক্ত ক'রে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়!"

"দামের হিসাবটা শুনি।"

"রোসো, তা'র আগে আমার মনে যে-ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ড হারবারের ঐ দিকটাতে। ছোটো একটি ষ্টীম লঞ্চ্ ক'রে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ক'ল্‌কাতায় যাতায়াত করা যায়।"

"আবার ক'ল্‌কাতায় কী দরকার প'ড়্‌লো?"

"এখন কোনো দরকার নেই সে-কথা জানো। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে,—ব্যবসা করিনে, দাবা খেলি। এটর্ণিরা বুঝে নিয়েচে কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপোষের মকদ্দমা হ'লে তা'র ব্রীফ আমাকে দেয়, তা'র বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেবো কাজ কাকে বলে,—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়—কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। ক'ল্‌কাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেচো তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।"

"বুঝেচি। তাহ'লে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও ক'ল্‌কাতায় যেতে হবে—দশটা পাঁচটা।"

"দোষ কী? কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ ক'র্‌তে।"

"কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনেয়?"

"না, না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি। ইচ্ছে ক'র্‌লেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পার্‌বে।"

"আচ্ছা, ইচ্ছে ক'র্‌বো। তা'র পর ?"

"স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, গঙ্গার ধার ; পাড়ির নীচে তলা থেকে উঠেচে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিলো তখন হয়তো এই বট গাছে নৌকো বেঁধে গাছ-তলায় রান্না চড়িয়েছিলো। ওরি দক্ষিণ ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধ'সে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের ছিপ্‌-ছিপে নৌকোখানি। তা'রই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম ব'লে দাও তুমি।"

"ব'ল্‌বো ? মিতালি।"

"ঠিক নামটি হ'য়েচে, মিতালি। আমি ভেবে-ছিলুম, সাগরী, মনে একটু গর্ব্বও হ'য়েছিলো। কিন্তু তোমার কাছে হার মান্‌তে হ'লো।… বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চ'লে গেচে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন ব'য়ে। তা'র ও-পারে তোমার বাড়ি এ-পারে আমার।"

"রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখ্‌বো ?"

"দেবো সাঁতার মনে-মনে, একটা কাঠের সাঁকোর

উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।”

“দীপক।”

“ঠিক নামটি হ’য়েচে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চূড়োয় বসিয়ে দেবো, মিলনের সন্ধ্যে-বেলায় তাতে জ্ব’ল্‌বে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। ক’ল্‌কাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা ক’র্‌বো। এমন হওয়া চাই সে-চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধ্যে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাৎ দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লজিক্‌ পড়্‌বার চেষ্টা ক’র্‌বো। আমাদের নিয়ম হ’চ্চে অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পাবো না।”

“আর তোমার বাড়িতে আমি?”

“ঠিক এক নিয়ম হ’লেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হ’লে সেটা অসহ্য হবে না।”

“নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম হ’য়ে না ওঠে তাহ’লে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুর্‌কা প’রে যাবো।”

“তা হোক্‌, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ চিঠি চাই।

সে-চিঠিতে আর কিছু থাক্‌বার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি চারটি লাইন মাত্র।"

"আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি এক-ঘরে?"

"তোমার নিমন্ত্রণ মাসে এক-দিন, পূর্ণিমার রাতে; চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যে-দিন চরম পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে।"

"এইবার তোমার প্রিয় শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।"

"আচ্ছা, বেশ।" পকেট থেকে একটা নোট্‌ বই বের ক'রে তা'র পাতা ছিঁড়ে লিখ্‌লে :—

Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ,
যে-শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ॥"

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত ব'ল্‌লে, "এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কতোদূর এগোলো।"

লাবণ্য একটা টুক্‌রো কাগজে লিখ্‌তে যাচ্ছিলো। অমিত ব'ল্‌লে, "না, আমার এই নোট্‌-বইয়ে লেখো।"

লাবণ্য লিখে দিলে,

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।"

অমিত বইটা পকেটে পূরে ব'ল্‌লে, "আশ্চর্য্য এই, আমি লিখেচি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেচো পুরুষের। কিছুই অসঙ্গত হয় নি। শিমুল কাঠই হোক্‌ আর বকুল কাঠই হোক্‌, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "নিমন্ত্রণ তো করা গেলো, তা'র পরে?"

অমিত ব'ল্‌লে, "সন্ধ্যাতারা উঠেচে, জোয়ার এসেচে গঙ্গায়, হাওয়া উঠ্‌লো ঝিরঝির ক'রে ঝাউগাছ-গুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠ্‌লো স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদীঘি, সেইখানে খিড়্‌কির নির্জ্জন ঘাটে গা ধুয়ে

চুল বেঁধেচো, তোমার এক-একদিন এক-একরঙের কাপড়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাবো আজকে সন্ধ্যেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মল্‌মলের ধুতি আর চাদর প'র্‌বো, পায়ে থাক্‌বে হাতির দাঁতে কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখ্‌বো, গাল্‌চে বিছিয়ে ব'সেচো, সাম্‌নে রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্ব'ল্‌চে ধূপ। পূজোর সময় অন্তত দু-মাসের জন্যে দু-জনে বেড়াতে বেরোবো। কিন্তু দু-জনে দু-জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্ব্বতে আমি যাবো সমুদ্রে।—এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেলো। এখন তোমার কী মত?"

"মেনে নিতে রাজি আছি।"

"মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে-যে তফাৎ আছে, বন্যা"

"তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি ক'র্‌বো না।"

"প্রয়োজন নেই তোমার ?"

"না, নেই। তুমি আমার যতোই কাছে থাকো তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে। কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পার্‌বে, সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল ক'রে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।"

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার কাছে আমি হার মান্‌তে পার্‌বো না, বন্যা, যাক্‌গে, আমার বাগানটা! ক'ল্‌কাতার বাইরে এক পা ন'ড়বো না। নিরঞ্জনদের আফিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেবো। সেইখানে থাক্‌বে তুমি, আর থাক্‌বো আমি। চিদাকাশে কাছে দূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পূব দেওয়ালে একখানা আয়না-ওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাক্‌বে বইয়ের আল্‌মারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সাম্‌নের দিকে

সেটাতে থাক্‌বে ছুটি পাঠকের একটি মাত্র সার্ক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তা'রই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি ব'স্‌বো এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আল্‌নার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দুহাত তফাতে। নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধ'র্‌বো কম্পিতহস্তে, তাতে লেখা থাক্‌বে ;—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া,
প্রেয়সীর সাথে যে-নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া॥

এটা কি খারাপ শোনাচ্চে, বন্যা ?"

"কিচ্ছুনা, মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হ'লো কোথা থেকে ?"

"আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তা'র ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিলো। তাকে উদ্দেশ ক'রে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে ক'ল্‌কাতাই ছাঁচে ঢালাই ক'রেছিলো, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্‌সে এম, এ পাশ ক'রে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না সমেত নব-বধূকে

লোকটা ঘরে আন্‌লে, চার চক্ষে চাওয়াও হ'লো, দক্ষিণে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌লে না। এখন তা'র অপর সরিককে কাব্যটির সর্ব্বস্বত্ব সমর্পণ ক'র্‌তে বাধ্‌বে না।"

"তোমারও ছাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নব-বধূ কি চিরদিনই নব-বধূ থাক্‌বে ?"

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত ব'ল্‌লে, "থাক্‌বে, থাক্‌বে, থাক্‌বে।"

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কী থাক্‌বে, অমিত? আমার টেবিলটা বোধ হ'চ্চে থাক্‌বে না।"

"জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাক্‌বে। সংসারে নব-বধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাক্‌বে নব-বধূ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।"

"এক-দিন সময় আস্‌বে, দেখাবো।"

"বোধ হ'চ্চে তা'র কিছু দেরি আছে, ততোক্ষণ খেতে চলো।"

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হ'লে অমিত ব'ল্‌লে, "কাল ক'ল্‌কাতায় যাচ্চি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ ক'র্‌চে আমি খাসিয়া হ'য়ে গেচি।"

"আত্মীয়-স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এতো বদল সম্ভব?"

"খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের? তাই ব'লে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে-বদল আজ আমার হ'লো এ কি জাত বদল, এ-যে যুগ বদল, তা'র মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেচেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।"

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছু-দূরে যেতে যেতে দু-জনের হাত মিলে গেলো, ওরা কাছে কাছে এলো

ঘেঁষে। নির্জ্জন পথের ধারে নীচের দিকে চ'লেচে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় প'ড়েচে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দী থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েচে; তা'র অঞ্জলি ভ'রিয়ে নিয়েচে অস্ত-সূর্য্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ ক'রে ছু-জনে দাঁড়ালো। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তা'র মুখটি উপরে তুলে ধ'র্‌লে। লাবণ্যর চোখ অর্দ্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গ'ড়িয়ে প'ড়চে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্চে; মাঝে মাঝে পাত্‌লা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্ম্মল নীল, মনে হয় তা'র ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্ত্যজগতের অব্যক্ত-ধ্বনি আসচে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হ'লো ঘন, সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রি বেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপ্‌ড়িগুলি বন্ধ ক'রে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে, "চলো এবার।" কেমন তা'র মনে হ'লো এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু ব'ল্‌লে না। লাবণ্যর

মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধ'রে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চ'ল্‌লো।

ব'ল্‌লে, "কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তা'র আগে আর দেখা ক'র্‌তে আস্‌বো না।"

"কেন আস্‌বে না ?"

"আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ্‌ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থাম্‌লো—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের স'য়ে ব'য়ে স্বর্গ।"

লাবণ্য কিছু ব'ল্‌লে না, অমিতর হাত ধ'রে চ'ল্‌লো। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তা'রই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হ'য়ে আছে। মনে হ'লো জীবনে কোনো দিন এমন নিবিড় ক'রে অভাবনীয়কে এতো কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভ দৃষ্টি হ'লো, এর পরে আর কি বাসর ঘর আছে ? রইলো কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে ক'র্‌তে লাগ্‌লো অমিতকে এখনি সেই প্রণামটি করে, বলে, তুমি আমাকে ধন্য ক'রেচো। কিন্তু সে আর হ'লো না।

বাসার কাছাকাছি আস্‌তেই অমিত ব'ল্‌লে, "বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো,

তাহ'লে সেটা মনে ক'রে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।"

লাবণ্য একটুখানি আবৃত্তি ক'রলে ঃ—

"তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্ত্তের দৈন্য রাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব্ব হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি,
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি'।"

"বন্যা, বড়ো অন্যায় ক'রলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বল্‌বার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এলো? তোমার এ কবিতা এখনি ফিরিয়ে নাও।"

"ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া-প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত ব'লেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না— এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?"

"কিন্তু আমি জান্‌তে চাই এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়?"

"রবিঠাকুরের।"

"তা'র তো কোনো বইয়ে এটা দেখিনি।"

"বইয়ে বেরোয় নি।"

"তবে পেলে কী ক'রে ?"

"একটি ছেলে ছিলো, সে আমার বাবাকে গুরু ব'লে ভক্তি ক'র্‌তো, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তা'র জ্ঞানের খাদ্য, এ-দিকে তা'র হৃদয়টিও ছিলো তাপস! সময় পেলেই সে যেতো রবিঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে আন্‌তো।"

"আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিতো।"

"সে-সাহস তা'র ছিলো না। কোথাও রেখে দিতো, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।"

"তাকে দয়া ক'রেচো ?"

"কর্‌বার অবকাশ হ'লোনা, মনে-মনে প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।"

"যে-কবিতাটি আজ তুমি প'ড়লে, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।"

"হাঁ, তা'রই কথা বই কি।"

"তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে প'ড়্‌লো ?"

"কেমন ক'রে ব'ল্‌বো ? ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর এক টুকরো কবিতা ছিলো, সেটাও আজ আমার কেন মনে প'ড়্‌চে ঠিক ব'ল্‌তে পারি নে :—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছো অশ্রু-জল।
এনেছো তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ-যে তায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদ শতদল।"

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে প'ড়্‌লো ? ঈর্ষা ক'র্‌তে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়—কিন্তু কেমন একটা ভয় আস্‌চে মনে। বলো, তা'র দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন ক'রে মনে প'ড়ে গেলো।"

"এক-দিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলো, তা'র পরে যেখানে ব'সে সে লিখ্‌তো সেই ডেস্কে এই কবিতা দুটি পেয়েচি। এর সঙ্গে রবি-

ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্চি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এলো।"

"সে-বিদায় আর এ-বিদায় কি একই?"

"কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? কিন্তু এ-তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে-কবিতা আমার ভালো লেগেচে তাই তোমাকে শুনিয়েচি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।"

"বন্যা, রবিঠাকুরের লেখা যতোক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততোক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য ক'রে ফুটে উঠ্‌বে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে তা'র আলোটাকে ময়লা ক'রে ফেলে।"

"দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তা'র আদরের জিনিষকে আপন অন্দর মহলে একলা নিজেরই ক'রে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যতো দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই ক'র্‌তে তা'র মন নেই।"

"তাহ'লে আমারও আশা আছে, বন্যা। আমার বাজারদরের ছোট্টো একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াবো।"

"আমাদের বাড়ি কাছে এসে প'ড়্‌লো, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।"

"রাগ ক'রোনা, বন্যা, আমি কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পার্‌বো না।"

"রাগ ক'র্‌বো কেন?"

"আমি একটি লেখককে আবিষ্কার ক'রেচি, তা'র ষ্টাইল্‌—"

"তা'র কথা তোমার কাছে বরাবরই শুন্‌তে পাই। ক'ল্‌কাতায় লিখে দিয়েচি তা'র বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।"

"সর্ব্বনাশ! তা'র বই! সে-লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপ্‌তে দেয় না। তা'র পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—"

"ভয় ক'রোনা, মিতা, তুমি তাকে যে-ভাবে

বোঝো আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেবো এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিৎ থাক্‌বে।"

"কেন?"

"আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাবো সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দু-জনের মনকে মিলিয়ে। ক'ল্‌কাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেল্‌ফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পার্‌বো। এখন তোমার কবিতাটি বলো।"

"আর ব'ল্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে না। মাঝখানে বড্ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হ'য়ে হাওয়াটা খারাপ হ'য়ে গেলো।"

"কিচ্ছু খারাপ হয়নি। হাওয়া ঠিক্ আছে।"

অমিত তা'র কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেলো :—

"সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্ব্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেচো বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েচে শুকতারাকে, সে আপনার রাত পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেচে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোক-রেখা রন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েচে। এই হ'লো ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেচে, সেইটে ছিঁড়ে ফেল্‌বার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুম্‌রে উঠ্‌চে। কী আইডিয়া! গ্র্যাণ্ড!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,
তন্দ্রা ঈষৎ করি' ক্ষুণ্ণ!

কিন্তু এমন হাল্কা ক'রে বাঁচার বোঝাটা-যে বড়্‌ডো বেশি; যে-নদীর জল ম'রেচে তা'র মন্থর স্রোতের

ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে-স্বপ্ন সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও ব'লচে :—

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হ'য়েচে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ? ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন ক'রে বাঁধ্‌বার আশা ও পেয়েচে, দিগন্তের ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুন্‌লো :—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ!
স্বপ্নে যে-বাণী হ'লো হারা
জাগরণে করো তা'রে পূর্ণ!

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আস্‌চে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তা'র প্রদীপ হাতে ক'রে এলো ব'লে :—

নিশীথের তল হ'তে তুলি'
লহো তা'রে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিলো ভুলি',
আলোকে তাহারে করো ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হ'লো লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধোজাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকাল-বেলা চ'লে যাবো। কিন্তু চ'লে যাওয়াকে তো শূন্য রাখ্‌তে চাইনে। তা'র উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতোদিন যা অস্পষ্ট ছিলো, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে, তোমার ঐ রবিঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।"

"রাগ করো কেন, মিতা? রবিঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না এ-কথা বারবার ব'লে লাভ কী?"

"তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—"

"ও কথা ব'লো না, মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর কারো সঙ্গে অমিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয় সেটাতে কি আমার দোষ?

না-হয় কথা রইলো, তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় এক-দিন আমার যদি জায়গা হয় তাহ'লে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাবো না।"

"কথাটা অন্যায় হ'লো-যে! পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন ক'র্‌বে এই জন্যেই তো বিবাহ।"

"রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুক্‌তে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর ক'রে বসাই।"

"ভালো ক'র্‌লুম না তর্ক তুলে'। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলায় সুর বিগ্‌ড়ে গেলো।"

"একটুও না। যা-কিছু ব'ল্‌বার আছে সব স্পষ্ট ক'রে ব'লেও যে-সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তা'র মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।"

"আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি ক'রেছিলুম।"

লাবণ্য হেসে ব'ল্‌লে, "আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ

বাড়ির বুল্‌ডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা তুল্‌চে দেখ্‌লেই ঘেউ ঘেউ ক'রে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তা'র হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তখ্‌মা দেখ্‌লে ল্যাজ নাড়ে।"

"তা মান্‌তেই হবে। পক্ষপাত জিনিষটা স্বাভাবিক জিনিষ নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাসে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হ'য়ে গেচে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ ব'ল্‌তে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো ব'ল্‌তেও তেম্‌নি সাহসের অভাব ঘটে। থাক্‌গে, আজ নিবারণ চক্রবর্ত্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জ্জমায়।"

"না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে ব'সে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধ্যেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্ত্তীর হওয়াই চাই! আর কারো নয়।"

অমিত উৎফুল্ল হ'য়ে ব'ল্‌লে, "জয় নিবারণ চক্রবর্ত্তীর! এতোদিনে সে হ'লো অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি ক'রে দেবো। তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।"

"তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাক্‌বে ?"

"না থাকে তো তাকে কান-মলে বিদায় ক'রে দেবো।"

"আচ্ছা কান-মলার কথা পরে স্থির ক'র্‌বো, এখন শুনিয়ে দাও।"—

অমিত আবৃত্তি ক'র্‌তে লাগ্‌লো ঃ—

কতো ধৈর্য্য ধরি'
ছিলে কাছে দিবস শর্ব্বরী।
তব পদ-অঙ্কন গুলিরে
কতোবার দিয়ে গেছো মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে—
তোমারে করিয়া যাবো দান
তব জয়-গান।
কতোবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠেনি জ্বলি',
শূন্যে গেছে চলি'
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।

কতোবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টীকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হ'য়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোম হুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিন-শেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।
লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি 'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহ-ভরে
তোমার ঐশ্বর্য্য মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিও আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।

১৩

আশঙ্কা

সকাল বেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত ব'লেছিলো শিলঙ্ থেকে যাবার আগে আজ সকাল বেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা কর্‌বার ভার দু-জনেরই উপর। কেননা, যে-রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিলো যথেষ্ট। সেটাকে ক'ষে দমন ক'র্‌তে হ'লো। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে-জায়গাটা থেকে চ'লে এলো য়ুক্যালিপটাস্-তলায়। হাতে দুই একটা বই ছিলো, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তা'র পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওল্‌টানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলি ব'ল্‌চে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হ'য়ে

গেলো। আজ সকালে এক-একবার মেঘ-রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্চে। মনে দৃঢ়বিশ্বাস-যে, অমিত চির-পলাতক, একবার সে স'রে গেলে আর তা'র ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে কখন্‌ সে গল্প সুরু করে, তা'র পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেচে চ'লে। লাবণ্য তাই ভাব্‌ছিলো ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইলো বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালেব আলোয়, অকাল অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন ন-টা, অমিত দুম্‌দাম্‌ শব্দে ঘরে ঢুকেই মাসিমা মাসিমা ক'রে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেবে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তা'র কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতোদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে তাঁর ঘরকে ভ'রে রেখেছিলো। সে চ'লে গেচে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকাল বেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে প'ড়চে। তাঁর বিচ্ছেদ-কাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন

নি; বুঝেছিলেন আজ তা'র দরকার ছিলো একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, কোলের থেকে বই গেলো প'ড়ে, জান্‌তেও পার্‌লে না। এ-দিকে যোগমায়া ভাঁড়ার-ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে ব'ল্‌লেন, "কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প না কি?"

"ভূমিকম্পই তো। জিনিষপত্র রওনা ক'রে দিয়েচি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখ্‌তে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা। সেখানে এক টেলিগ্রাম।"

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "খবর সব ভালো তো?"

লাবণ্যও ঘরে এসে জুট্‌লো। অমিত ব্যাকুল মুখে ব'ল্‌লে, "আজই সন্ধ্যেবেলায় আস্‌চে সিসি, আমার বোন, তা'র বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তা'র দাদা নরেন।"

"তা ভাবনা কিসের, বাছা? শুনেচি ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি এক-রকম ক'রে জায়গা হবে না?"

"সেজন্যে ভাবনা নেই, মাসি। তা'রা নিজেরাই টেলিগ্রাফ ক'রে হোটেলে জায়গা ঠিক ক'রেচে।"

"আর যাই হোক্ বাবা, তোমার বোনেরা এসে-যে দেখ্‌বে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছো সে কিছুতেই হবে না। তা'রা আপন লোকের ক্ষ্যাপামির জন্যে দায়িক ক'র্‌বে আমাদেরকেই।"

"না মাসি, আমার প্যারাডাইস্ লস্‌ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতি-পরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতি-সভ্য কামরায়।"

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেলো। এতোদিন একটা কথা ওর মনেও আসেনি-যে, অমিতর যে-সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্ত্তেই সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লে। অমিত-যে আজ ক'ল্‌কাতায় চ'লে যাচ্ছিলো তা'র মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্ত্তি ছিলো না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হ'লো এইটেতেই লাবণ্য বুঝ্‌লে যে-বাসা এতোদিন ওরা দু-জনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গ'ড়ে তুল্‌ছিলো সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।"

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে

ব'ল্‌লে, "আমি হোটেলেই যাই, আর জাহান্নমেই যাই কিন্তু এইখানেই রইলো আমার আসল বাসা।"

অমিত বুঝেচে সহর থেকে আস্‌চে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে-মনে নানা প্ল্যান ক'র্‌চে যাতে সিসির দল এখানে না আস্‌তে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আস্‌ছিলো যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘ'ট্‌তে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা-সম্বন্ধে অমিতর এতো বেশি উদ্বেগ যোগমায়ার কাছে অসঙ্গত ঠেকেছিলো; লাবণ্যও ভাব্‌লে অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হ'য়ে দাঁড়ালো।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?"

লাবণ্য একটু যেন কঠিন ক'রে ব'ল্‌লে, "না, সময় নেই।"

যোগমায়া ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "যাওনা মা, বেড়িয়ে এসো গে।"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "কর্ত্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ো অবহেলা হ'য়েচে। খুবই অন্যায় ক'রেচি। কাল রাত্রেই ঠিক ক'রেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।" ব'লে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত ক'রে রইলো।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌লেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "আমিও চ'ল্‌লুম কর্ত্তব্য ক'র্‌তে, ওদের জন্যে সব ঠিক ক'রে রাখা চাই।"

এই ব'লে চ'লে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লে, "বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্চে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েচি। বাড়ির মালেক অবাক, নিশ্চয় ভেবেচে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার ক'রে থাক্‌বো। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েচে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটীরের ঐশ্বর্য্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাক্‌বে।"

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া

প'ড়্লো। ব'ল্লে, "আর কারো কথা অতো ক'রে তুমি ভাবো কেন? না হয় আর সবাই জান্তে পার্লে। ঠিকমতো জান্তে পারাই তো চাই, তা হ'লে কেউ অমর্য্যাদা ক'র্তে সাহস করে না।"

এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত ব'ল্লে, "বন্যা, ঠিক ক'রে রেখেচি, বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাক্বো। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেচে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও-বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেচো, মিতা। আবার এক-দিন যদি ঢুক্তে চাও দেখ্বে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সে-দিন তুমি ব'লেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্য্যের। তা'র পরে শেষ সাধনার কথা বলো নি, সেটা হ'চ্চে ত্যাগের।"

"বন্যা, ওটা তোমাদের রবিঠাকুরের কথা। সে লিখেচে, সাজাহান আজ তা'র তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেলো। একটা কথা তোমার কবির মাথায়

আসেনি—যে, আমরা তৈরি করি, তৈরি জিনিষকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন্। একটা অনাসৃষ্টি ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি ক'র্‌লেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই ব'লে ঐ ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে সাজাহান মমতাজের অক্ষয় ধারা ব'য়ে চ'লেচেই, ওরা কি একজন মাত্র? সেই জন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হ'তেই পার্‌লো না। নিবারণ চক্রবর্ত্তী বাসর ঘরের উপর একটা কবিতা লিখেচে,—সেটা তোমাদের কবি-বরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্‌ট্‌-কার্ডে লেখা :—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হ'য়ে প্রভাতের রথচক্র রবে।
হায়রে বাসর ঘর,
বিরাট বাহির সে-যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ঙ্কর।
তবু সে যতোই ভাঙে চোরে,
মালা-বদলের হার যতো দেয় ছিন্ন ছিন্ন ক'রে,
তুমি আছো ক্ষয়হীন
অনুদিন ;

তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।

কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি' তব শয্যাতল ?
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তা'রাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর॥

রবিঠাকুর কেবল চ'লে যাবার কথাই বলে, র'য়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে-যে, আমরাও দু-জন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেবো, দরজা খুল্‌বে না ?”

“মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাব্‌চো প্রথম দিন থেকেই আমি জান্‌তে পারিনি-যে, তুমিই নিবারণ চক্রবর্ত্তী ? কিন্তু তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনি আমাদের ভালো-

বাসার সমাধি তৈরি ক'রতে সুরু ক'রো না, অন্তত তা'র মরার জন্যে অপেক্ষা ক'রো।"

অমিত আজ নানা বাজে কথা ব'লে ভিতরের কোন্ একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিলো।

অমিতও বুঝ্‌তে পেরেচে কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধ্যে-বেলায় বেখাপ হয়নি, আজ সকাল বেলায় তা'র সুর কেটে যাচ্চে। কিন্তু সেইটে-যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগ্‌লো না। একটু নীরসভাবে ব'ল্‌লে, "তা হ'লে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হ'চ্চে হোটেল পরিদর্শন। ওদিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্ত্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোলো বুঝি।"

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধ'রে ব'ল্‌লে, "দেখো, মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা ক'র্‌তে পারো। যদি এক-দিন চ'লে যাবার সময় আসে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ ক'রে চ'লে যেয়ো না।" এই ব'লে চোখের জল ঢাক্‌বার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেলো।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তা'র পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেলো য়ুক্যালিপ্‌টাস্

তলায়। দেখ্‌লে সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধ'র্‌লে। জীবনের ধারা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে তা'র যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সকরুণ। তা'র পরে দেখ্‌লে ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবিঠাকুরের "বলাকা"। তা'র নীচের পাতাটা ভিজে গেচে। একবার ভাব্‌লে ফিরিয়ে দিয়ে আসিগে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিলো পকেটে। হোটেলে যাবো-যাবো ক'র্‌লে, তাও গেলো না; ব'সে প'ড়্‌লো গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব ক'রে মেজে দিয়েচে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ পাচ্চে চারদিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্ত-গুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেক্‌লো। আস্তে আস্তে বেলা চ'লে যাচ্চে, তা'র ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনি খুব ক'যে কাজে লাগ্‌বে ব'লে লাবণ্যের পণ ছিলো, তবু যখন দূর থেকে দেখ্‌লে অমিত গাছতলায় ব'সে, আর থাক্‌তে পার্‌লে না, বুকের ভিতরটা

হাঁপিয়ে উঠ্‌লো, চোখ এলো জলে ছল্‌ছলিয়ে। কাছে এসে ব'ল্‌লে, "মিতা, তুমি কী ভাব্‌চো?"

"এতোদিন যা ভাব্‌ছিলুম একেবারে তা'র উল্‌টো।"

"মাঝে মাঝে মনটাকে উল্‌টিয়ে না দেখ্‌লে তুমি ভালো থাকো না। তা তোমার উল্‌টো ভাব্‌নাটা কী রকম শুনি।"

"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতোদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগ্‌চে সকাল বেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলা-ওয়ালা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চ'ল্‌বে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক্‌, বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধঘর থেকে বের ক'রে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চ'ল্‌লে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান্‌ লোক, পথ কেবল দু-জনের।"

"ডায়মণ্ড্‌ হারবারের বাগানটা তো গেচেই, তা'র-পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর বেচারাও গেলো। তা যাক্‌গে। কিন্তু চ'ল্‌বার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কী

রকম ক'র্‌বে ? দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুক্‌বে, আর আমি আর একটাতে ?"

"তা'র দরকার হয় না, বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। ব'সে-থাকাটাই বুড়োমি।"

"হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হ'লো, মিতা ?"

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েচি। তা'র নাম শুনেচো বোধ হয়, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদওয়ালা। ভারত ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান ক'র্‌বে ব'লে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে প'ড়েচে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার ক'র্‌তে চায়, আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে ব'ল্‌লে, "শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম্‌-এ দিয়েচি। তা'র সব খবরটা শুন্‌তে ইচ্ছে করে।"

"এক সময়ে সে ক্ষেপেছিলো আফগানিস্থানের প্রাচীন সহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে-পুরোনো রাস্তা চ'লেছিলো, সেইটেকে আয়ত্ত ক'র্‌বে।

ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তা'রও পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব ক'ষে পুষ্তু প'ড়্‌লে, পাঠানী কায়দা-কানুন অভ্যেস ক'র্‌লে! সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখ্‌তে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধ'র্‌লে সেখানে ফরাসী পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেচেন তাঁদের কাছে পরিচয়-পত্র দিতে, ফ্রান্সে থাক্‌তে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি প'ড়েচি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত সরকারের ছাড়-চিঠি জুট্‌লো না। তা'রপর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলি পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হ'য়েচে হিমালয়ের পূর্ব্ব প্রান্তটাতেও সন্ধান ক'র্‌বে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের রাস্তা এ-দিক দিয়ে কোথায় গেচে সেইটে দেখ্‌তে চায়। ঐ পথ-ক্ষ্যাপাটার কথা মনে ক'রে আমারও মন উদাস হ'য়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েচে পথের পুঁথি প'ড়্‌তে, মানব-বিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী, বলো।"

"প্রথম যৌবনে এক-দিন শোভনলাল কোন্ কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিলো, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিট্‌কিয়ে প'ড়েচে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানিনে, কিন্তু এক-দিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হ'লো প্রায় দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিলো, একটা ফুলন্ত জারুল গাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো এক-জনের কথা ব'ল্‌তে গেলো, নাম ক'র্‌লে না, বিবরণ কিছুই ব'ল্‌লে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হ'য়ে এলো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেলো। বুঝ্‌তে পার্‌লুম ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে ও পায়ে-পায়ে ক্ষইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্বের ঝোঁক এলো, নুয়ে প'ড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, ঘাসের মধ্যে সাদায়-হ'ল্‌দেয় মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তা'র পাপড়িগুলো গুণে দেখার জরুরি দরকার প'ড়্‌লো।

অমিত ব'ল্‌লে "জানো, বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েচো।"

"কেমন ক'রে ?"

"আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হ'লো তুমি তা'র মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু-মাস ধ'রে মনে-মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে ব'ল্‌লুম, এসো বধূ, ঘরে এসো। তুমি আজ বধূ-সজ্জা ধ'সিয়ে ফেল্‌লে, ব'ল্‌লে, এখানে জায়গা হবে না, বন্ধু, চিরদিন ধ'রে আমাদের সপ্তপদী গমন হবে।"

বনফুলের বটানি আর চ'ল্‌লো না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে প'ড়ে ক্লিষ্টস্বরে ব'ল্‌লে, "মিতা, আর নয়, সময় নেই।"

১৪

ধূমকেতু

এতোদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার ক'রেচে-যে লাবণ্যর সঙ্গে তা'র সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালী জানে। গভর্মেণ্ট আফিসের কেরাণীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে-বা মন্ত্রীবর। এমন সময় তাদের চোখে প'ড়্লো মানব-জীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্ত্তন, একেবারে ফার্ষ্ট্ ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্য্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয়-নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চ'ল্চে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে প'ড়েছিলো কুমার মুখুজ্জে—এটর্ণি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিলো। তা'র একটা কারণ, সে এদের

দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে-গ্রহটি তাকে বিশেষ ক'রে টান মারচে তা'র নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দ্দন ক'রে চ'লে যায়, কিন্তু দেখ্‌তে পাই তাতে ধূমকেতুর ল্যাজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেচে। তাকে না দেখ্‌তে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায়নি ব'লে তা'র বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তা'র মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে এইটেই তা'র ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ক'রেচে এবং নিজেকে ভুলিয়েচে-যে ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝ্‌তে পারেনি। কিন্তু দেখেও দেখ্‌তে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত। চুরি বিদ্যের মতোই, তা'র সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার ক'রে দেখ্‌বার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালী সমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ ক'রেচে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে "অমিত রায়ের অমিতাচার।" মুখে সব চেয়ে নিন্দে ক'রেচে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ ক'রেচে তা'রাই। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাক্‌বে ব'লেই স্থির ছিলো, কিন্তু জনশ্রুতি বিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে ক'ল্‌কাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তা'র চুরুট-ধূমাকৃত অত্যুক্তি উদ্গারে সিসি-লিসি মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন ক'র্‌লে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতোক্ষণে অনুমান ক'রে থাক্‌বেন-যে, সিসি-দেবতার বাহন হ'চ্চে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তা'র অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে এমন কথা উঠেচে। সিসি মনে-মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেচে। অমিতর সম্মতি সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হ'তে পার্‌বে ব'লে ঠিক ক'রেছিলো, কিন্তু অমিত হাম্বাগ্‌টা না ফেরে ক'ল্‌কাতায়, না দেয়

চিঠির জবাব। ইংরেজি যতোগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তা'র জানা ছিলো সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ ক'রেচে। এমন কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়েনি,—কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য ক'রে উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তা'র কোনো দাহ-রেখা রইলো না। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'লো অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্ব্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায় টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তা'র আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হ'চ্চে ব'লে আমাদেব পলিটিক্সের যে-আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিলো। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জ্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ ক'রেছিলো, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিষ্ট ব'লে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও

অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এই জন্যে আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো সহরের বোহীমিয় পাড়ায় সে বাস ক'রেচে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হ'লো, এখন সে ছবির সমজদারীতে পরিপক্ক ব'লেই নিজের প্রমাণ-নিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চট্‌কাতে পারে। ফরাসী ছাঁচে সে তা'র গোঁফের দুই প্রত্যন্ত দেশকে সযত্নে কণ্টকিত ক'রেচে, এ-দিকে মাথায় ঝাঁক্‌ড়া চুলের প্রতি তা'র সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তা'র ভালোই, কিন্তু আরো ভালো কর্‌বার মহার্ঘ্য সাধনায় তা'র আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাস-বৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তা'র মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হ'তো। দামী হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোষ্টে ফরাসী ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো—এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি ক'র্‌তে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্‌জিশালার রেজেষ্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা, এমন

সব কোঠায়, যেখানে খুঁজ্‌লে পাতিয়ালা কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ্‌-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্‌ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য-সম্পদে সে তা'র দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা,—বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স্‌। সাধারণ বাঙালী মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্ব্বের প্রতি গর্ব্ব সহকারেই কেটি দিয়েচে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির ল্যাজের মতো বিলুপ্ত হ'য়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন ক'র্‌চে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিলো স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে তাকে দেখ্‌তেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি-বা লক্ষ্য করে

তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁট দুটিতে সরল মাধুর্য্য ছিলো, এখন বার-বার বেঁকে বেঁকে তা'র মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হ'য়ে গেচে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি, তা'র পরিভাষা জানিনে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাৎলা সাপের খোলষের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আস্‌চে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত ক'রে যত্নের ভঙ্গীতে আলগোচে রাখ্‌বার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জ্জিত-নখর-রমণীয় দুই আঙ্গুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতোটা অলঙ্করণের অঙ্গরূপে ততোটা ধূমপানের উদ্দেশে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুর-ওয়ালা জুতো-জোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগল জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হ'য়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্ত্তা ভুল ক'রেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভুত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন ক'রে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায়নি, কিন্তু ডবল্ প্রোমোশন পেয়ে চ'লেচে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুসিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্ব্বদা একটা চলন বলন টগবগ ক'র্‌চে, উপাসক মণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় কোথাও তা'র ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে র'য়ে গেচে অতীত যুগ ; পায়ের দিকে সাড়ির বহর ইঞ্চি দুই তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসম্বৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে ; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্ত্তে দুই হাতেই বালা ; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল ; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার আমসত্ত পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না, ক্রিষ্টমাসের প্লাম্ পুডিঙ্‌ এবং পৌষপার্ব্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষ-টার প্রতিই তা'র লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচ-ওয়ালীর কাছে সে নাচ শিখেচে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সঙ্কোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে চ'লে এসেচে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণী-বিভাগে লাবণ্য গবর্ণেস্। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মার্‌বার জন্যেই তা'র "স্পেশাল্ ক্রিয়েশান্"। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে ক'ষে আঁক্‌ড়ে ধ'রেচে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সর্ম্মাজ্জনপটু হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে হবে। চতুর্ম্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষ-পাত ও পক্ষপাত এক সঙ্গেই ক'রে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গ'ড়েচেন নিরেট্ নির্ব্বোধ ক'রে। তাই, স্বজাতি-মোহমুক্ত আত্মীয় মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এতো দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কী রকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক ক'রেচে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জান্‌তে দেওয়া হবে না। তা'র আগেই শত্রু-পক্ষকে আর রণক্ষেত্রকে দেখে আসা চাই। তা'রপর দেখা যাবে মায়াবিনীর কতো শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে প'ড়্লো অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিলো না। তবু সে তখন ছিলো প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝক্‌ঝকে। এখন কেবল-যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হ'য়েচে তা নয়, সব শুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েচে। ও যেন কাঁচা হ'য়ে গেচে, এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া ক'রে বেড়াতো, এখন ওর সে সখ নেই ব'ল্‌লেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে ক'রেচে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি এক-দিন ওকে স্পষ্টই ব'ল্‌লে, "দূর থেকে আমরা মনে ক'র্‌ছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে-নাম্‌চো। এখন দেখ্‌চি তুমি হ'য়ে উঠ্‌চো, যাকে বলে গ্রীণ, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্‌টিঙ্‌ নয়।"

অমিত বার্ডস্বার্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে ব'ল্‌লে, প্রকৃতির সংসর্গে থাক্‌তে থাক্‌তে নির্ব্বাক

নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি ব'লেচেন "mute insensate things."

শুনে সিসি ভাব্‌লে, নির্ব্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই,যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা ক'রেছিলো লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুল্‌বে। এক-দিন দু-দিন তিন-দিন যায় সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেলো, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশি রকম ঢেউ খাচ্চে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তা'রপরে মুখ দেখে মনে হয় ঝোড়ো হাওয়ায় যে-কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হ'য়ে ঝুল্‌চে তা'রই মতো শত দীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাব্‌নার কথাটা এই-যে রবিঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেচে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যের নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লালকালী দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিষটার দাম বাড়িয়েচে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, ক্ষিদে

সংগ্রহ ক'র্তে চ'লেচি। ক্ষিদের জোগানটা কোথায়, আর ক্ষিদেটা খুবই-যে প্রবল তা অন্যদের অগোচর ছিলো না। কিন্তু তা'রা এমনি অবুঝের মতো ভাব ক'র্তো যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর কিছু আছে এ-কথা কেউ ভাব্‌তে পারে না। সিসি মনে-মনে হাসে, কেটি মনে-মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এতো একান্ত-যে বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তা'র নেই। তাই সে নিঃসঙ্কোচে সখী-যুগলের কাছে বলে, "চ'লেচি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।" কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর তা'র গতিটা কোন্ অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে-যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝ্‌তেই পারে না। আজ ব'লে গেলো, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা ক'র্তে চ'লেচে। মেয়ে দুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় ব'ল্‌লে, এই অপূর্ব্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল, তা'রাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত ব'ল্‌লে পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। ব'লেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন ক'রেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির ক'র্‌লে আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান

করা চাই। এ-দিকে নরেন্ গেচে ঘোড়দৌড়ের মাঠে; সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিলো। সিসি গেলো না। এই নিবৃত্তিতে তা'র কতোখানি শমদমের দরকার হ'য়েছিলো তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হ'য়ে চাকরদেব কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। গাড়ি বারাণ্ডায় এসে চোখে প'ড়্‌লো বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চ'ল্‌চে। বুঝ্‌তে বাকি রইলো না, এরি মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টকটক ক'রে উপরে উঠে ইংরেজিতে ব'ল্‌লে, "দুঃখিত।"

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে ব'ল্‌লে, "কা'কে চান আপনারা?"

কেটি একমুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লে, "মিস্‌টার অমিট্রায়ে এখানে এসেচেন কি না খবর নিতে এলুম।"

লাবণ্য হঠাৎ বুঝ্‌তেই পার্‌লে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। ব'ল্‌লে, "তাঁকে তো আমরা চিনিনে।"

অম্‌নি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ-ঠারা-ঠারি হ'য়ে গেলো, মুখে প'ড়্‌লো একটা আড়হাসির রেখা। কেটি ঝাঁঝিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে ব'ল্‌লে, "আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him।"

ভাব দেখে লাবণ্য চম্‌কে উঠ্‌লো, বুঝ্‌লে এরা কে আর ও কী ভুলটাই ক'রেচে। অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কর্ত্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।"

লাবণ্য চ'লে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তোমার টীচার?"

"হাঁ।"

"নাম বুঝি লাবণ্য?"

"হাঁ।"

"গট্‌ ম্যাচেস্‌?"

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ ক'র্‌তে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝ্‌লো না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কেটি ব'ল্‌লে, "দেশালাই।"

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এলো। কেটি

সিগারেট ধরিয়ে টানতে টান্‌তে সুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ইংরেজি পড়ো ?"

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চ'লে গেলো। কেটি ব'ল্‌লে, "গবর্ণেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানার্স শেখেনি।"

তা'র পরে দুই সখীতে টীপ্পনী চ'ল্‌লো। "ফেমাস্‌ লাবণ্য! ডিল্লীশস্‌! শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্‌ক্যানো বানিয়ে তুলেচে, ভূমিকম্পে অমিটর হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ-ধার থেকে ও-ধার! সিলি! মেন্‌ আর্‌ ফানি।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌লো। এই হাসিতে ঔদার্য্য ছিলো। কেননা, পুরুষ মানুষ নির্ব্বোধ ব'লে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটেনি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েচে, দিয়েচে একেবারে চৌচীর ক'রে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত ধরণে কাপড়-পরা গবর্ণেস্‌! মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া, কাছে ব'স্‌লে মনটাতে বাদ্‌লার বিস্কুটের মতো ছাতা প'ড়ে যায়। কী ক'রে অমিট্‌ ওকে এক মোমেণ্টও সহ্য করে!

"সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা ক'রে হাঁটে। কোন্ এক সৃষ্টিছাড়া উল্টো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হ'য়েচে এঞ্জেল।"

এই ব'লে টেবিলে এল্‌জেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারট্‌টা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রূপোর শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের ক'রে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেন্সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুল্‌লে। দাদার কাণ্ডজ্ঞান-হীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধ নয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের 'পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্য্য ভঙ্গ হয়। খুব ক'রে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের সাড়ি প'রে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এলো না। কেটির সঙ্গে এসেছিলো ঝাঁকড়া চুলে দুই চোখ আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্র-কায়া ট্যাবি নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ ক'রেচে। যোগ-মায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ

জন্মালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাম্‌নের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্ম্মল সাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত ক'রে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন ক'র্‌লে। সিসি ঘাড় ধ'রে টেনে আন্‌লে কেটির কাছে, কেটি তা'র নাকের উপর তর্জ্জনী তাড়ন ক'রে ব'ল্‌লে, "নটি ডগ্‌।"

কেটি চৌকি থেকে উঠ্‌লোই না। সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। যোগমায়ার 'পরে তা'র আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁৎ আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল ক'র্‌চে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সাম্‌নে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে ব'ল্‌লে, "আমি সিসি, অমির বোন।"

যোগমায়া একটু হেসে ব'ল্‌লেন, "অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারো মাসি হই, মা।"

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই

ক'র্লেন না। সিসিকে ব'ল্লেন, "এসো, মা, ঘরে ব'স্বে এসো।"

সিসি ব'ল্লে, "সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেচি, অমি এসেচে কি না।"

যোগমায়া ব'ল্লেন, "এখনো আসেনি।"

"কখন আস্বেন জানেন ?"

"ঠিক ব'ল্তে পারিনে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসিগে।"

কেটি তা'র স্বস্থানে ব'সেই তীব্র স্বরে ব'লে উঠ্লো, "যে-মাস্টার্নি এখানে ব'সে পড়াচ্ছিলো সে-তো ভান ক'র্লে অমিট্‌কে সে কোনোকালে জানেই না।"

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেলো। বুঝ্‌লেন কোথাও একটা গোল আছে। এ-ও বুঝ্‌লেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্ত্তে মাসিত্ব পরিহার ক'রে ব'ল্লেন, "শুনেচি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।"

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট ক'রেই হাস্‌লে। তাকে ভাষায় ব'ল্লে বোঝায়, "লুকোতে পারো, ফাঁকি দিতে পার্‌বে না।"

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে-মনে আগুন হ'য়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য্য তা'র মনকে টেনেছিলো। তাই, যখন দেখ্‌লে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়্‌লে না, তা'র মনে কেমন সঙ্কোচ লাগ্‌লো। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন্ দমন ক'র্‌তে ক্ষিপ্রহস্ত,—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তা'র কোনো সঙ্কোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তা'রা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালমানুষী বলে, বন্ধুদের মধ্যে তা'র কোনো লক্ষণ দেখ্‌লে তাকে সে অস্থির ক'রে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা ব'লে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সঙ্কুচিত তা'রা কোনো-মতে কেটিকে প্রসন্ন রাখ্‌তে পার্‌লে আরাম পায়। সিসি সেই দলের,—সে কেটিকে মনে-মনে যতোই ভয় করে ততোই তা'র নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্ব্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ

বুঝেছিলো যে, তা'র ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়েছিলো। তাই সে ঠিক ক'রেছিলো, যোগমায়ার সাম্‌নে সিসির এই সঙ্কোচ কড়া ক'রে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠ্‌লো, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে ক'রেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্মে মুখ এগিয়ে নিয়ে এলো। প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে সিসির সাহস ক'র্‌লে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। তবু জোর ক'রে এম্‌নি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতোটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মার্‌তে প্রস্তুত—that much for it!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক্‌। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো মাথায় ছিলো ফেল্‌ট্‌ হ্যাট, গায়ে ছিলো বিলিতি কোর্ত্তা। এখানে দেখা যাচ্চে পরনে তা'র ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিলো তা'র সেই কুটীরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্‌ফ, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরাম কেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয়

নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ ক'র্‌তে দেওয়া হয় না। সেই জন্যে, বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পান সভার পূর্ব্বে এ-বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনো প্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্য-সম্মত সুযোগ অমিতর ছিলো না। এই সময়টা কোনো মতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আস্‌তো।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই ক'ল্‌কাতা থেকে এসেচে তা'র আঙটি। কেমন ক'রে সে সেই আঙটি লাবণ্যকে পরাবে তা'র সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে ব'সে ব'সে কল্পনা ক'রেচে। আজ হ'লো ওর একটা বিশেষ দিন। এ-দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চ'ল্‌বে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেচে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্চে সেইখানে গিয়ে ব'ল্‌বে,—একদিন হাতীতে চ'ড়ে বাদ্‌শা এসেছিলো, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট ক'র্‌তে হয় তাই সে ফিরে গেচে, নতুন তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করেনি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো ক'রে রেখেচো,—

সেটাকে ভাঙো. রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ-কথাও মনে ক'রে এসেছিলো যে, ওকে ব'ল্‌বে,ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাংক্‌চুয়ালিটি ;—কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তা'র মূল্য জানবে কী ক'রে ?

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে,—মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা ছয়টার মতো। অমিত ঘড়ি দেখ্‌লে না, পাছে ঘড়িটা তা'র অভদ্র ইসারায় আকাশের প্রতিবাদ করে। যেমন বহু দিনের জ্বোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্ম্মমিটর মিলিয়ে দেখ্‌তে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিলো নির্দ্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দার যে-কোণটায় ব'সে লাবণ্য তা'র ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আস্‌তে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখ্‌লে সে-জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লো। এতোক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে ব'লেছিলো নিয়ম-পালনটা মানুষের,

অনিয়মটা দেবতার; মর্ত্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাবো ব'লেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্ত্ত্যেই দেখা দেয় তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম ক'রে নিতে হয়। আশা হ'লো, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেচে-বা; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন ক'রে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেচে, সাধারণ দিনের বেড়া গেচে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তা'র মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্চে। অসম্মান-যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝ্‌তে বাকি রইলো না। ট্যাবি কুকুরটা তা'র প্রথম মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা ক'র্‌ছিলো। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার জন্যে আবার অসংযত হ'য়ে উঠ্‌লো। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্ভাব প্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে "মাসি" ব'লে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের

কাছে প'ড়ে তা'র পায়ের ধুলো নিলে। এ-সময়ে এমন ক'রে প্রণাম করা তা'র প্রথার মধ্যে ছিলো না। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "মাসিমা, লাবণ্য কোথায় ?"

"কী জানি, বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।"

"এখনো তো তা'র পড়্‌বার সময় শেষ হয়নি।"

"বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেচে।"

"চলো, একবার দেখে আসি সে কী ক'র্‌চে।" যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেলো। সম্মুখে-যে আর কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার ক'র্‌লে।

সিসি একটু চেঁচিয়েই ব'লে উঠ্‌লো, "অপমান! চলো, কেটি, ঘরে যাই।"

কেটিও কম জ্বলেনি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি ব'ল্‌লে, "কোনো ফল হবে না।"

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, "হ'তেই হবে ফল।"

আরো খানিকটা সময় গেলো। সিসি আবার ব'ল্‌লে, "চলো ভাই, আর একটুও থাক্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে না।"

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে ব'সে রইলো। ব'ল্‌লে, "এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।"

অবশেষে বেরিয়ে এলো অমিত, সঙ্গে নিয়ে এলো লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্দ্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিলো না। অমিত তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলো। এক-মুহূর্ত্তের মধ্যেই কেটির চোখে প'ড়্‌লো লাবণ্যর হাতে আঙটি। মাথায় রক্ত চন্‌ ক'রে উঠ্‌লো, লাল হ'য়ে উঠলো তুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মার্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌লো।

অমিত ব'ল্‌লে, "মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু র'য়ে গেলো অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।"

ইতিমধ্যে আর এক উপদ্রব! সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্দ্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ ব'লেই গণ্য ক'র্‌লে। একবার অগ্রসর হ'য়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁস্-

ফোঁসানিতে যুদ্ধের আশুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হ'য়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হ'তেই অহিংস্র গর্জ্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে ক'রে অপরিমিত চীৎকার সুরু ক'রে দিলে। বিড়ালটা তা'র কোনো প্রতিবাদ না ক'রে পিঠ ফুলিয়ে চ'লে গেলো। এইবার কেটি সহ্য ক'র্তে পার্লে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগ্‌লো। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাস্‌লো।

এই গোলমালটা একটু থাম্‌লে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্‌লে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোনোনি, কিন্তু বোধ হ'চ্চে, আর দশজনের কাছ থেকে শুনেচো। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেচে, ক'ল্‌কাতায় অঘ্রান মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে আন্‌তে দেরি ক'র্‌লে না। ব'ল্‌লে, "আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌! কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয়নি ব'লেই ঠেক্‌চে, রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেচে মুখের কাছে।"

সিসি তা'র স্বাভাবিক অভ্যাসমতো হী হী ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

লাবণ্য বুঝ্‌লে কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝ্‌লে না।

অমিত তাকে ব'ল্‌লে, "আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো, কোথায় যাচ্চো? আমি ব'লেছিলুম বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাস্‌চে। ওটা আমারই দোষ;—আমার কোন্ কথাটা-যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।"

কেটি শান্ত স্বরেই ব'ল্‌লে, "কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিৎ হ'লো. এবার আমারো যাতে হার না হয়, সেটা করো।"

"কী ক'র্‌তে হবে, বলো।"

"নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে ব'লেছিলো, জেণ্টেল্‌ম্যানরা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস্ দেখ্‌তে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে ব'লেছিলুম, তোমাকে রেস্-এ নিয়ে যাবোই। এদেশে যতো ঝর্‌না, যতো মধুর দোকান আছে সব সন্ধান ক'রে শেষ কালে এখানে এসে তোমার দেখা

পেলুম। বলো না, ভাই সিসি, কতো ফির্‌তে হ'য়েচে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose!"

সিসি কোনো কথা না ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌লো। কেটি ব'ল্‌লে, "মনে প'ড়্‌চে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেচি, অমিট্‌। কোন্‌ পার্শিয়ান ফিলজফার তা'র পাগ্‌ড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে ব'সেছিলো। ব'লেছিলো, পালাবে কোথায়? মিস্‌ লাবণ্য যখন ব'লেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু আমার মন ব'ল্‌লে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আস্‌তেই হবে।"

সিসি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠ্‌লো।

কেটি লাবণ্যকে ব'ল্‌লে, "অমিট্‌ আপনার নাম মুখে আন্‌লে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে ব'ল্‌লে, কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বল্‌বার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেল্‌লেন, অমিট্‌কে জানেনই না। তবু সান্‌ডে স্কুলের বিধান মতো ফল ফ'ল্‌লো না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই

খেয়ে নিলেন, আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জান্‌লেন, এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো, সিসি, কী অন্যায়!"

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তা'র সামাজিক কর্ত্তব্য মনে ক'রে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে; তৃতীয়বার তাকে দমন করা হ'লো।

কেটি ব'ল্‌লে, "অমিট্ তুমি জানো, এই হীরের আঙটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাক্‌বে না। এ আঙটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হ'য়ে গেচে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি এ'কে বাজিতে খোয়াতে হবে?"

সিসি ব'ল্‌লে, "বাজি রাখ্‌তে গেলে কেন, ভাই?"

"মনে-মনে নিজের উপর অহঙ্কার ছিলো, আর মানুষের উপর ছিলো বিশ্বাস। অহঙ্কার ভাঙ্‌লো,—এবারকার মতো আমার রেস্ ফুরোলো, আমারি হার। মনে হ'চ্চে অমিট্‌কে আর রাজি ক'র্‌তে পার্‌বো না। তা এমন অদ্ভুত ক'রেই যদি হারাবে সেদিন এতো আদরে আঙটি দিয়েছিলে কেন? সে-দেওয়ার মধ্যে

কি কোনো বাঁধন ছিলো না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিলো না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘ'ট্‌তে দেবে না?"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কেটির গলা ভার হ'য়ে এলো, অনেক কষ্টে চোখের জল সাম্‌লে নিলে।

আজ সাত বৎসর হ'য়ে গেলো, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আঙটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে প'রিয়ে দিয়েছিলো। তখন ওরা তুজনেই ছিলো ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবী যুবক ছিলো কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপোষে অমিত সেই পাঞ্জাবীর সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিলো। অমিতরই হ'লো জিৎ। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা ব'লে উঠেছিলো, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তা'র ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেচে। সেইক্ষণে অমিত কেটির হাতে আঙটি পরিয়ে দিলে, তা'র মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিলো কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিলো না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগেনি, তা'র হাসিটি সহজ ছিলো, ভাবের আবেগে তা'র মুখ রক্তিম হ'তে বাধা পেতো না। আঙটি হাতে পরা হ'লে অমিত তা'র কানে কানে ব'লেছিলো—

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা ব'ল্তে শেখেনি। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে-মনে ব'লেছিলো, "মন্ আমী," ফরাসী ভাষায় যা'র মানে হ'চ্চে, বঁধু।

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেলো। ভেবে পেলে না, কী ব'ল্বে।

কেটি ব'ল্লে, "বাজিতে যদিই হার্‌লুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্, অমিট্। আমার হাতে রেখে এ'কে আমি মিথ্যে কথা ব'ল্তে দেবো না।"

ব'লে আঙটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুত বেগে চ'লে গেলো। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ক'রে চোখের জল গড়িয়ে প'ড়্তে লাগ্‌লো।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এলো লাবণ্যের হাতে, শোভনলালের লেখা :—

"শিলঙে কাল রাত্রে এসেচি। যদি দেখা ক'র্তে অনুমতি দাও তবে দেখ্তে যাবো। না যদি দাও কালই ফির্বো। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েচি, কিন্তু কবে কী অপরাধ ক'রেচি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বুঝ্তে পারিনি। আজ এসেচি তোমার কাছে সেই কথাটি শোন্বার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাইনে। ভয় ক'রো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।"

লাবণ্যর চোখ জলে ভ'রে এলো। মুছে ফেল্লে। চুপ ক'রে ব'সে ফিরে তাকিয়ে রইলো নিজের অতীতের দিকে। যে-অঙ্কুরটা বড়ো হ'য়ে উঠ্তে পার্তো অথচ যেটাকে চেপে দিয়েচে, বাড়্তে দেয়নি, তা'র সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এলো। এতোদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার ক'রে তাকে সফল ক'র্তে পার্তো। কিন্তু সেদিন ওর ছিলো জ্ঞানের

গর্ব্ব ; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্ব্বলতা ব'লে মনে-মনে ধিক্কার দিয়েচে। ভালোবাসা আজ তা'র শোধ নিলো, অভিমান হ'লো ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হ'তে পার্‌তো নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো ;— সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ ক'র্‌তে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ ক'র্‌তেও বুক ফেটে যায়। মনে প'ড়্‌লো অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্ত্তি। তা'র পরে কতোদিন গেচে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতোদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইলো ? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখ্‌লে, "তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পূরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাওনি ; আজও তোমার যা দেবার জিনিষ তাই দিতে এসেচো কিছুই দাবী না ক'রে। চাইনে ব'লে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহঙ্কারও নেই।"

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েচে এমন সময় অমিত এসে ব'ল্‌লে, "বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসিগে।"

অমিত ভয়ে-ভয়েই ব'লেছিলো, ভেবেছিলো লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই ব'ল্‌লে, "চলো।"

দুজনে বেরোলো। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা ক'র্‌লে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধ'র্‌তে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধ'র্‌লে তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তা'র বেশি কিছু মুখে এলো না। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সেদিনকার সেই জায়গাতে এলো যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেলো। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেলো মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেইদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

লাবণ্য আস্তে আস্তে ব'ল্‌লে, "একদিন একজনকে যে-আঙটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে-আঙটি খোলালে কেন?"

অমিত ব্যথিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "তোমাকে, সব কথা বোঝাবো কেমন ক'রে, বন্যা। সেদিন যাকে আঙটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তা'রা দুজনে কি একই মানুষ?"

লাবণ্য ব'ল্‌লে, "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।"

অমিত ব'ল্‌লে, "কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে-আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তা'র দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।"

"কিন্তু, মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ ক'রেছিলো, তাকে তুমি আপনার ক'রে রাখ্‌লে না কেন? যে-কারণেই হোক্‌ আগে তোমার মুঠো আল্‌গা হ'য়েচে তা'র পরে দশের মুঠোর চাপ প'ড়েচে ওর উপরে, ওর মূর্ত্তি গেচে বদ্‌লে। তোমার মন একদিন হারিয়েচে ব'লেই দশের মনের মতো ক'রে নিজেকে সাজাতে ব'স্‌লো। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হ'তো না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাক্‌তো। থাক্‌গে ওসব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখ্‌তে হবে।"

"বলো, নিশ্চয় রাখ্‌বো।"

"অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পারো ওকে আমোদ দিতে পার্‌বে।"

অমিত একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা।"

তা'র পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে ব'ল্‌লে, "একটা কথা তোমাকে বলি, মিতা, আর কোনোদিন ব'ল্‌বো না। তোমার সঙ্গে আমার যে-অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ ক'রে ব'ল্‌চিনে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই ব'লচি, আমাকে তুমি আঙটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখ্‌বার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্‌ নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে প'ড়্‌বে না।"

এই ব'লে নিজের আঙুলের থেকে আঙটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধ'রেচে, তেম্‌নি নীরবে, তেম্‌নি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধ'র্‌লে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেলো। ঘর বন্ধ, সবাই চ'লে গেচে। কোথায় গেচে তা'র কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি।

সেই য়ুক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়ালো, খানিকক্ষণ ধ'রে শূন্য মনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "ঘর খুলে দেবো কি? ভিতরে ব'স্‌বেন?" অমিত একটু দ্বিধা ক'রে ব'ল্‌লে, "হাঁ।"

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বস্‌বার ঘরে গেলো। চৌকি, টেবিল, শেল্‌ফ্‌ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তা'র উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব্‌, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেন্সিল টেবিলের উপরে। পেন্সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে প'ড়্‌লো, লোহার খাটটা শব্দ ক'রে উঠ্‌লো। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা! তাকে প্রশ্ন ক'র্‌লে কোনো কথাই

ব'ল্‌তে পারে না। সে একটা মূর্চ্ছা, যে-মূর্চ্ছা কোনো-দিনই আর ভাঙ্‌বে না।

তা'র পরে শরীর মনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন ক'রে অমিত গেলো নিজের কুটীরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিলো তেমনিই সব আছে। এমন কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যাননি। বুঝ্‌লে, তিনি স্নেহ ক'রেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেচেন, মনে হ'লো যেন শুন্‌তে পেলে, শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান, বাছা। সেই চৌকির সাম্‌নে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম ক'র্‌লে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চ'লে গেচে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেলো না।

১৭

শেষের কবিতা

ক'ল্‌কাতার কলেজে পড়ে যতিশঙ্কর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তা'র সঙ্গে নানা-বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তা'র মনটাকে চম্‌কিয়ে দেয়, মোটরে ক'রে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তা'র পর কিছুকাল যতিশঙ্কর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা ক'রে ব'ল্‌চে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে প'ড়ে লেগেচে। কাজ পেয়েচে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতোদিন অমিত মূর্ত্তি গড়্‌বার সখ মেটাতো কথা দিয়ে, আজ পেয়েচে সজীব মানুষ। সে-মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙীন্ পাপ্‌ড়িগুলো খসাতে রাজি,

চরমে ফল ধ'র্‌বে আশা ক'রে। অমিতর বোন্‌ লিসি না কি ব'ল্‌চে, যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে না কি বড্‌ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্চে। বন্ধুদের সে ব'লে দিয়েচে তাকে কেতকী ব'লে ডাক্‌তে; এটা তা'র পক্ষে নির্লজ্জতা, যে-মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি প'র্‌তো সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা-শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে না কি নিভৃতে ডাকে "কেয়া" ব'লে। এ-কথাও লোকে কানাকানি ক'র্‌চে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তা'র হাল ধ'রেচে আর অমিত তাকে প'ড়ে শোনাচ্চে রবিঠাকুরের "নিরুদ্দেশ যাত্রা।" কিন্তু লোকে কী না বলে! যতিশঙ্কর বুঝে নিলে অমিতর মনটা পাল তুলে চ'লে গেচে ছুটিতত্ত্বের মাঝ-দরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এলো। সহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তা'র বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতী এ প্রসঙ্গ শোনেনি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘ'টেচে। পূর্ব্বের মতোই যতীকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না, যতী বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইচে

এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতীকে ডাক পাড়ে না। যতীর বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয়, যে, অমিতর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতী আর থাকতে পার্‌লে না। অমিতকে নিজেই গায়ে-প'ড়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "অমিতদা, শুনলুম, মিস্ কেতকা মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?"

অমিত একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌লে, "লাবণ্য কি এ খবর জেনেচে?"

"না, আমি তাকে লিখিনি। তোমার মুখে পাকা খবর পাইনি ব'লে চুপ ক'রে আছি।"

"খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে।"

যতী হেসে ব'ল্‌লে, "এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে করো যদি তো বিয়েই ক'র্‌বে, সোজা কথা।"

"দেখো, যতী, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌সনারিতে যে-কথার এক মানে বেঁধে দিই মানব-জীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হ'য়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।"

যতী ব'ল্‌লে, "অর্থাৎ তুমি ব'ল্‌চো বিবাহ মানে বিবাহ নয়।"

"আমি ব'ল্‌চি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তা'র মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তা'র মানে বের ক'র্‌তে গেলেই ধাঁধা লাগে।"

"তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না।"

"সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে ব'ল্‌তে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহ'লেও আর একটা কথায় গিয়ে প'ড়্‌বো, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।"

"তাহ'লে অমিতদা, কথা বন্ধ ক'র্‌তে হয়-যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটবো আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া ক'র্‌লে ডাইনে, আর ডাইনে তাড়া ক'র্‌লে বাঁয়ে মার্‌বে দৌড় এমন হ'লে তো কাজ চলে না।"

"ভায়া, মন্দ বলোনি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেচে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাৎ দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি; উপায় কি? তাতে

বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক্ চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।"

"তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম ক'র্‌তে হবে?"

"এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয় তাহ'লে খতম ক'র্‌তে দোষ নেই।"

"ধ'রে নাও না প্রাণের গরজেই।"

"সাবাস্, তবে শোনো।"

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতী আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান ক'রে আস্‌চে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই-যে অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্ণে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে ক'রে বেড়ানো বন্ধ ক'রেচে। অমিতকে ও সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রেচে।

অমিত ব'ল্‌লে, "অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হ'লে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্ব'ল্‌তে

থাকে, সেই আগুন জীবনের নানাকাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝ্‌তে পেরেচো?”

“সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝ্‌বার ইচ্ছে আছে।”

“যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে-ভালোবাসা বিশেষ-ভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হ'য়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।”

“তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌চি, কি না, সেইটেই বুঝ্‌তে পারিনে। আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলো, অমিতদা।”

অমিত ব'ল্‌লে, “একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েচি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে ব'সেচি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো।”

“কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিল্‌তে পারে না?”

“জীবনে অনেক সুযোগ ঘ'টতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তা'র ভাগ্য ভালো,—যে তা না পায় দৈবক্রমে তা'র যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর

বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সে-ও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।”

“কিন্তু—”

“কিন্তু তুমি যাকে মনে করো রোম্যান্স্ সেইটেতে ক’ম্তি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই ক’রে জোগাতে হবে না কি? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স্ আমিই সৃষ্টি ক’র্‌বো। আমার স্বর্গেও র’য়ে গেলো রোম্যান্স্, আমার মর্ত্ত্যেও ঘটাবো রোম্যান্স্। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে ক’রে দেয় তাদেরই তুমি বলো রোম্যান্টিক! তা’রা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরম হংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলেস্থলে উপলব্ধি ক’র্‌বো, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইলো আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা ক’র্‌বো সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক্ আমার লাবণ্যর, জয় হোক্ আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক্ অমিত রায়।”

যতী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো. বোধ করি কথাটা তা'র ঠিক লাগ্‌লো না। অমিত তা'র মুখ দেখে ঈষৎ হেসে ব'ল্‌লে, "দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা ব'ল্‌চি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা ব'লে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝ্‌বে। আমাকে গাল দিয়ে ব'স্‌বে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট ক'রেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই ব'ল্‌তে হবে নইলে এ-সব কথার রূপ চ'লে যায়—কথাগুলো লজ্জিত হ'য়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালো-বাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুল্‌বো, প্রতিদিন ব্যবহার ক'র্‌বো। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে-ভালোবাসা, সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আন্‌বার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যতী একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কিন্তু অমিতদা, তুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?"

"যার হয় তা'রই হয়, আমার হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—"

"তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না

ব'ল্‌তে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাবো যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্চি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

"তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাবো। কিন্তু তা'র আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?"

"দেবো।"

অমিতর এই চিঠি :—

সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ ক'রেচি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষ-মুহূর্ত্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্ত্তীটা যেদিন ধরা প'ড়েচে সেইদিন ম'রেচে— অতি সৌখীন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারি কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ-কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে :—

তব অন্তর্দ্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।

লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি ;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি' গিয়েছো আপনি ॥

জীবন আঁধার হ'লো, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হ'তে
পূজামূর্ত্তি ধরি' প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে ॥
মিতা

তা'র পরেও আরও কিছুকাল গেলো। সেদিন কেতকী গেচে তা'র বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেলো না। আরাম-কেদারায় ব'সে সাম্‌নের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেম্‌সের পত্রাবলী প'ড়্‌চে। এমন সময় যতিশঙ্কর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তা'র হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ-মাস পরে, জৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্ব্বতের শিখরে। অপর পাতে—

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্টে আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি' তা'র জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হ'তে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হ'য়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হ'তে যদি দেখো চাহি'
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

কোনোদিন কর্ম্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হ'তে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,

সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তা'রে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাকো, তাহারি আরতি
হোক্ তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ,
তৃষার্ত্ত আবেগ-বেগে

ভ্রষ্ট নাহি হবে তা'র কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে-ভাব-রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তা'র সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তা'র না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

মোর লাগি' করিয়ো না শোক,
আমার র'য়েছে কর্ম্ম, আমার র'য়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হ'তে আনি'
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি

যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তা'র
পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ ক'রেছো যত ঋণী তত ক'রেছো আমায়।
হে বন্ধু, বিদায় ॥

বন্যা

ব্যালাক্রুয়ি, বাঙ্গালোর
২৫ জুন, ১৯২৮